রুপালী রেখা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আভেনির ॥ কলকাতা ১৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৩

প্রকাশক
অমলেন্দু চক্রবর্তী
আভেনির
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স্‌ প্রাইভেট লিঃ
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

দাম তিন টাকা চার আনা

শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী

বন্ধুবরেষু

সুপুরুষ

একেবারে রাস্তার ওপরেই বাড়ি। জানলা দিয়ে লোক চলাচল দেখা যায়। পায়ে হাঁটা মানুষ আর চলন্ত বাসে বসে যাওয়া যাত্রী—জানলায় দাঁড়ালে সবই চোখে পড়ে। সংসারের কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে মণিকা প্রায়ই এসে এই জানলার কাছে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের চলাচল দেখে। কত চেনা মানুষ, অচেনা মানুষ এই পথ দিয়ে যায় আসে। চলন্ত বাসের ভিতরে কেবল কতকগুলি মাথা দেখা যায়। কালো চুলের মাথা, পাকা চুলের মাথা, বিনা চুলের মাথা—কত রকমের মাথাই যে আছে সংসারে, আর কত রকমের মুখ, কত রকমেব চেহারা। দেখতে বেশ লাগে। একবার দেখবার নেশা মনের মধ্যে জন্মিয়ে নিতে পারলে, দেখে দেখে দিনরাত্ত কাটিয়ে দেওয়া যায়। মণিকার মনে হয় সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। সারা জীবন না হোক, সারা যৌবন তো কেটেই গেল।

মাঝে মাঝে মণিকার মা কুমুদিনী এসে মেয়ের কাছে দাঁড়ান, 'অমন করে কি দেখছিস মণি।'

মণিকা ফিরে না তাকিয়েই বলে, 'কি আবার দেখব।'

কুমুদিনী বলেন, 'দেখছিস না তো অমন করে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন। তোর পা ভেঙে আসে না?'

মণিকা সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'না।'

কুমুদিনী বলেন, 'আশ্চর্য, একপায়ে তুই অতক্ষণ একটানা কি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস তাই ভাবি।'

মণিকা এবার মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে, 'ভাববার কি আছে মা। আমি তো এই এক পা নিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকিনে, হাঁটি চলি কাজ কর্ম করি। এ তো ছেলেবেলা থেকেই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

কুমুদিনী বলেন, 'তা হয়ে গেছে অবিশ্যি, কিন্তু যাই বলিস তোর ভাব ভঙ্গি দেখে মাঝে মাঝে আমার ভারি ভয় হয় বাপু।'

মণিকা জবাব দেয়, 'অবাক করলে মা। আমার ভাব ভঙ্গির মধ্যে ভয়ের কি দেখলে।'

কুমুদিনী যেতে যেতে বলেন, 'ভয় নয় দুঃখ। কি যে দুঃখ তা তুই বুঝবিনে। তোকে তো আর মা হতে হয়নি।'

মণিকা অদ্ভুত একটু হাসে, 'তা ঠিক। এজন্মে শুধু পুরোপুরি মেয়ে হয়ে থাকার সুখই ভোগ করে গেলাম। কারো মা বউ হওয়ার দুঃখ, আর পেতে হলনা। সেই এক সান্ত্বনা।'

কুমুদিনী আর সেখানে দাঁড়ালেন না। ঘরের কাজকর্ম পড়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলে তাঁর চলেনা।

পাড়ার নন্দ ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে দাবা খেলা সেরে অনেক রাত্রে ফিরে আসেন পেনসনভোগী পান্নালাল রায়। তিনি এসে প্রায়ই দেখতে পান মণিকা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁরও ভালো লাগে না। অসন্তোষের ভঙ্গিতেই বলেন, 'এত রাত্রেও ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিলি মণি।'

মণিকা জবাব দেয়, 'কি আবার করব বাবা। অমনি দাঁড়িয়েছিলাম।'

পান্নালাল বলেন, 'অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে তোর কষ্ট হয় না?'

মণিকা জবাব দেয়, 'বসে থাকতে আরো কষ্ট হয় বাবা।'

পান্নালাল বলেন, 'শুধু বসে থাকবি কেন। বইটই পড়বি। তোর জন্যেই তো লাইব্রেরী থেকে দুখানা করে বই আনি।'

মণিকা জবাব দেয়, 'অবসর মত বইতো পড়ি বাবা।'

পান্নালাল বলেন, 'তারপর দক্ষিণ দিকে যে একটু ফুলের বাগান করেছি, সেখানেও কাজ করতে পারিস। সবাই বলে গার্ডেনিং খুব চমৎকার হবি।'

মণিকা মৃদুস্বরে বলে, 'বাগানেও যাই বাবা।'

পান্নালাল সে কথা স্বীকার করে বলেন, 'তা অবশ্য যাস। বাগানের ওপর তোর যত্ন আছে। না হলে বছর ভরে অত ফুল ফুটতনা।'

মণিকা বলে, 'এবার হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবা, চল তোমার ভাত বেড়ে দিই।'

পান্নালাল বলেন, 'হ্যাঁ চল। কিন্তু তুই যদি দাবা খেলাটা আমার কাছ থেকে শিখে নিতিস মণি তাহলে আমাকে আর সঙ্গী জোটাবার জন্যে পাড়া ভরে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়না, বাপ মেয়ে দুজনে মিলে দাবা খেলেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। দাবা কি যে মজার খেলা মা, তাতো তুই আর বুঝলিনে।'

মণিকা হাসে, 'না বাবা, ও মজাটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকল না। চেষ্টা করে তো তুমিও দেখলে আমিও দেখলাম। এক মজা সকলের জন্যে নয়।'

পান্নালাল তখনকার মত আর কোন কথা বলেন না। কিন্তু খেয়ে দেয়ে শুতে যাওয়ার আগে মেয়েকে ডেকে ফের একটু উপদেশ দেন, 'কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস মণি, এক মজা সকলের জন্যে নয়। তুই অবশ্য মজার জন্যে জানলায় দাঁড়াসনে তা আমি জানি। তবে পাড়ার সকলেই কিন্তু ওতে ভারি মজা পায়। তারা নানা কথা বলাবলি করে।'

মণিকা শান্তভাবে বলে, 'করুক না। তাতে কি আমাদের কিছু এসে যায়! ওদের কথায় কান দেওয়ার বয়স আমি অনেক দিন পার হয়ে এসেছি বাবা।'

পান্নালাল বলেন, 'কিন্তু লোকে যে হাসাহাসি করে মা।'

মণিকা বলে, 'করুকনা বাবা, আমাকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখেও লোকে প্রথম প্রথম খুব হাসত। এখন তো আর হাসে না। দেখতে দেখতে আজকের হাসাহাসিও ওদের এক দিন বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি ভেবনা।'

পান্নালাল ব্যথা পান। তাঁর মুখের ভাবে সেই ব্যথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তা দেখেও তাঁকে কোমল কথায় সান্ত্বনা দেওয়ার কোন চেষ্টা না করে

মণিকা নিজের ঘরে চলে যায়। যে বাপ মা জন্ম দুর্ভাগিনী মেয়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে পরের কথা কানে তোলেন তাঁরা যদি দুঃখ পান সে দুঃখ মণিকা ঘুচাতে পারবে না।

মণিকার দুঃখই কি কেউ কোনদিন ঘুচাতে পেরেছে। জীবনটা যে নিতান্তই দুঃখময় সে বোধ মণিকার চার পাঁচ বছর বয়স থেকেই হয়েছিল। আরো অল্প বয়সে টাইফয়েডে তার কোমর থেকে শুরু করে বাঁ পা-টা একেবারেই শুকিয়ে যায়। এই যা ওয়াটা যে কি তা যত বয়স বাড়তে লাগল ততই বেশি করে টের পেতে লাগল মণিকা। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সে হাঁটতে পারেনা, ছুটতে পারেনা। তাকে চলতে হয় আস্তে আস্তে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পাড়ার সবাই তাকে নেংড়ী বলে ডাকে।

মণিকার পৃথিবী তখন থেকেই দুঃখে ভরা। সেই দুঃখের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল ছোট বোন অনীতা। মণিকার চেয়ে সে বছর তিনেকের ছোট। কিন্তু যেমন সুন্দরী তেমনি স্বাস্থ্যবতী। অনি যে শুধু বাপমা'রই নয়নের মণি তাই নয়, দিদিরও আনন্দের নিধি। দুই বোনে ভারি ভাব। মণিকাকে কেউ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলে অনীতা কোমরে আঁচল জড়িয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে যায়। দিদির দুঃখ সে যেমন বোঝে তেমন আর কেউ নয়।

পান্নালাল বাবু মণিকার চিকিৎসার জন্যে টাকা খরচ কম করেননি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। তারপর চেষ্টা করলেন মণিকার বিয়ের। জামাইকে বিলাত পাঠাবার কি বাড়ি গাড়ি করে দেওয়ার মত ক্ষমতা অবশ্য পান্নালালের ছিল না। সামান্য পোষ্টমাষ্টারের চাকরি। অত টাকা কোথায় পাবেন। তবু দু'হাজার টাকা পযন্ত পণ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একখানা পায়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ অত সামান্য টাকা নিয়ে মণিকার স্বামীর পদ গ্রহণ করতে কেউ রাজী হয়নি। যারা মণিকাকে দেখতে এসেছে তারা অনীতাকে পচ্ছন্দ করে তার সঙ্গে সম্বন্ধের প্রস্তাব করে গেছে। শেষ পর্যন্ত অনীতা নিজেকে লুকিয়ে রাখত। যারা কনে দেখতে আসত তারা অনীতার দেখা পেত না। তবু একদিন দেখা দিতেই হল। ম্যাট্রিকুলেশনের বেশি বাপ

মা তাকে আর পড়ালেন না। আঠের বছরের বেশি আর তাকে অনূঢ়া থাকতে দিলেন না। জোর করেই তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের আগে অনীতার সে কি কান্না। 'দিদি তোর কি হবে।' মণিকা বলেছিল, 'আমার কিছুই হবে না অনি। কিন্তু তোর অনেক হবে। স্বামী, ছেলেমেয়ে। তোর পাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমি পাব।'

কিন্তু মণিকার আশা পূরণ হয়নি। অনীতার বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু দশবছরের মধ্যে একটিও ছেলেমেয়ে হয়নি আর বোধ হয় হবেও না। তার স্বামী প্রভাত বোস তেমন মিশুক নয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন পছন্দ করে না। আরো অপছন্দ করে বাংলাদেশকে। সরকারী চাকরি। ইচ্ছা করে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজে বদলী হয়। কলকাতার দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথম প্রথম অনীতা দিদিকে দুঃখ জানিয়ে চিঠিপত্র লিখত। আস্তে আস্তে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জীবনের সঙ্গে আপোষ করেছে অনীতা। আর প্রভাত সেই সন্ধির শর্ত হিসেবে বছর বছর স্ত্রীর শাড়ি গয়নার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। বাড়িগাড়ির জন্যে টাকা জমাচ্ছে।

*   *   *

কিন্তু বিয়ের পরে যাই ঘটুক না কেন ছোটবোনের এই বিয়ে মণিকার জীবনে প্রথম বড় ঘটনা। এত বড় উৎসব এ বাড়িতে আর হয়নি, হবেও না। পাঁড়াগায়ের ঝোপ ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা এই ভাঙা বাড়ির ঘরে ঘরে সেদিন আলো জ্বলেছিল। সানাই বেজেছিল, শাঁখ বেজেছিল। এখনো স্পষ্ট মনে আছে মণিকার। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে সারি সারি গাড়ি দাঁড়াল। আর সেই গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বর আর বরযাত্রীর দল। সেই দলের মধ্যেই ছিল প্রভাতের মাসতুতো ভাই সঞ্জয়। বয়স প্রভাতের মতই সাতাশ আঠাশ। কিন্তু প্রভাতের মত রং তার কালো নয়, উজ্জ্বল গৌর। প্রভাতকে বেঁটে বলা চলে না, কিন্তু সঞ্জয়ের মত অমন ছফুট লম্বা সে নয়। মাথায় অমন কোঁকড়ানো চুল তার নেই। নেই অমন মুখ চোখের শ্রী।

এমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ মণিকা আর দেখেনি। তার দীপ্তিতে প্রভাত নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। শুধু রূপই নয়, রঙও আছে মানুষটির মনে। সেই মনের রঙ তার মুখের কথায় মাখামাখি। প্রভাত ভারি রাশভারি গুরুগম্ভীর মানুষ। কথা বলে কম। কিন্তু সঞ্জয় একেবারে তার উল্টো। সে সব সময় সবাক। মণিকাকে ডেকে খুঁজে সেই বার করেছিল—'কই, আমাদের বেয়ান কই। আসুন আলাপ করি।'

লজ্জা সংকোচ বেশিক্ষণ রাখতে পারেনি মণিকা। সঞ্জয়ের কথার জবাবে কথা বলতেই হয়েছে। ঠাট্টা তামাসার উত্তর প্রায় জোর করেই আদায় করে নিয়েছে সঞ্জয়। বলেছে, 'দুটি না, চারটি না, আপনি প্রভাতের একটি মাত্র শালী, আমাদের একটি মাত্র বেয়ান। আপনার অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না। আমাদের খোঁজ খবর যত্ন আত্তির সব ভার নিতে হবে। যতবার ডাকব ছুটে ছুটে আসবেন।'

মণিকা হেসে বলেছে, 'খোঁড়া পা নিয়ে, আমি আপনাদের সঙ্গে তাল রেখে কি করে অত ছুটোছুটি করি বলুন।'

আর কেউ হলে আহাহা করে সহানুভূতি জানাত। কিন্তু সঞ্জয় সে ধার দিয়েও গেলনা। হেসে বলল, 'কানা হোন, খোঁড়া হোন বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের ছুটতেই হয়। তাছাড়া মানুষ কি কেবল পায়ে চলে, পায়ে ছোটে?'

মণিকা জিজ্ঞাসা করেছে, 'তবে?'

সঞ্জয় জবাব দিয়েছে, 'ছুটতে হলে চাই মন। ব্যোমযানটা হালের আমদানী, মনোযানটা চিরকালের। পা না থাকে নাই থাকল, মনটা তো আছে।'

মণিকা হেসে বলেছে, 'আছে নাকি? কি করে টের পেলেন?'

সঞ্জয় জবাব দিয়েছে, 'আপনার চোখ দেখে। মনের কথা পুরুষের মুখে ফোটে, মেয়েদের চোখে।'

কথাটা অবশ্য নিচু গলাতেই বলেছিল সঞ্জয়। কিন্তু আশে পাশে আরো যে সব মেয়ে ছিল সে কথা তাদের কারোরই কানে যেতে বাকি রইলনা।

মণিকা পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে। কিন্তু বেশিক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারলনা। সঞ্জয়ের চা চাই, পান চাই, আর সবই মণিকার নিজে হাতে করে দেওয়া চাই। আর কারো দেওয়া পছন্দ হবেনা সঞ্জয়ের।

বিয়ের পরদিন ভোরে বরযাত্রীরা সকলেই চলে গেল। গেলনা কেবল সঞ্জয়। সে বর কনের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত রইল। সারাটা দিন হৈ চৈ আমোদ ফুর্তি করে কাটাল। বেশির ভাগ ফুর্তিই তার মণিকার সঙ্গে। তার তামাসাগুলি অনেকেরই কানে লাগে, বাড়াবাড়িটা চোখে বাজে। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনা। শত হলেও বিয়ে বাড়ি। রঙ রসের ছড়াছড়ি তো হবেই।

অনীতাই অবশ্য পরদিন মণিকাকে সাবধান করে দিল, 'দিদি, সঞ্জয় বাবুর সঙ্গে বেশি মিশিসনে। লোকটি ভালোনা।'

'কেনরে।'

'ওর কাছে শুনলুম সঞ্জয় বাবু পাঁড় মাতাল। মদ ছাড়া এক মিনিটও ওর চলেনা। বিয়ে বাড়িতেও মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে এসেছে।'

'ওমা, তাই নাকি। কথা বলার সময় বিশ্রি একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল সে কি মদের গন্ধ।'

'তা ছাড়া কি। আর চোখ দুটো কি রকম লালচে দেখেছিস তো?'

মণিকা গম্ভীর ভাবে বলল, 'দেখেছি।'

কিন্তু এত সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও মণিকাকে সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে অনীতা অবাক হয়ে গেল। একটু তিরস্কারের সুরেই বলল, 'দিদি তুই কী। সঞ্জয় বাবুর ভাব চরিত্র দেখে কোন মেয়ে ওর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছেনা। তুই যাচ্ছিস কি করে? মাতালকে তোর ভয় নেই?'

মণিকা হেসে বলল, 'না অনি, মাতাল দাঁতাল কাউকেই আমি ভয় করিনে। আমি যে খোঁড়া তা সবারই চোখে পড়ে।'

সঞ্জয়ের নেশার কথা সকলেই জানতে পারল। পেশার কথাটাও অজানা রইলনা। সঞ্জয় অভিনেতা। থিয়েটারে সিনেমায় এ্যাক্ট করে। নিকৃষ্ট

আত্মীয় কেউ নেই। মেসে হোটেলে যখন যেখানে খুশি থাকে। এম. এ. পর্যন্ত নাকি পড়েছিল। কিন্তু অত পড়াশুনো বিশেষ কাজে লাগেনি। অভিনেতা হিসেবেও তেমন খ্যাতি হয়নি সঞ্জয়ের, অথচ মদ্যপ বলে অখ্যাতি যথেষ্ট আছে। কোন দিক থেকেই লোকটি নির্ভরযোগ্য নয়। তবু তাকে মণিকার ভালো লেগে গেল। দুজনে ঠিকানা বিনিময় করল। এমন কি চিঠি পত্রের বিনিময়ও চলতে লাগল। ভারি চমৎকার চিঠি লেখে সঞ্জয়, মুখের কথাকে কলমের মুখে বসিয়ে দিতে জানে।

অনীতা তা দেখে সাবধান করে দিল, 'দিদি তুই ওর ছলনায় ভুলিসনে। লোকটা ভালোনা। ও নাকি সব মেয়েকেই একই ভাষায় চিঠি লেখে, সব মেয়ের সঙ্গে একই ধরণে কথা বলে।'

মণিকা জবাব দিল, 'তা বললই বা, খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে ও যে মন খুলে কথা বলে, চোখ তুলে তাকায় সেই তো ওর মহত্ব।'

অনীতা প্রতিবাদ করে, 'মোটেই মহত্ত্ব নয়, মহত্ত্বের ভাণ। উনি বলেন সারা দুনিয়াটাই ওর কাছে ষ্টেজ আর মেয়ে মাত্রেই নায়িকা।'

মণিকা ভাবে না হয় ষ্টেজের নায়িকাই সে হল। অনির মত বাসর ঘরের নায়িকা তো জীবনে কোন দিন তার হওয়ার আশা নেই। কিন্তু সঞ্জয় সেনের সবই যে অভিনয় তা মণিকার মনে হয় না। সঞ্জয় তাকে চিঠি লেখে, তার অভিনয় দেখবার জন্য কমপ্লিমেণ্টারি কার্ড পাঠায়। খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলে সত্যি এসে হাজির হয়, রাত্রে থাকে। আর সারাক্ষণ মণিকার সঙ্গে গল্প গুজব হাসি ঠাট্টা করে। বাড়ির মধ্যে কোণের দিকে ছোট একটা অন্ধকার ঘর সে বেছে নিয়েছে। সেইখানেই তার থাকবার জায়গা করে দেয় মণিকা। সারা রাত সে মদের নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে থাকে। অনেক বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

একেকবার সে মণিকাকে ডেকে বলে, 'যাই বল, তোমার এই ডেরাটি ভারি সুন্দর। মনে হয় যেন কবরের মধ্যে পরম আরামে শুয়ে রয়েছি। এমন জায়গা সারা কলকাতা শহরে আর নেই।

মণিকা বলে, 'সেইজন্যই বুঝি এখানে আসেন।'

সঞ্জয় তার রাঙা চোখ মেলে মণিকার দিকে তাকায়, 'শুধু সেই জন্তেই নয়। তোমার জন্তেও আমাকে এখানে আসতে হয়।'

মণিকা বলে, 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

সঞ্জয় বলে, 'না ঠাট্টা কেন করব। আচ্ছা মণি, আমি তোমাকে তুমি বলছি, কিন্তু তুমি সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কেবল আপনিই চালিয়ে যাচ্ছ। তুমিও আমাকে তুমি বলে ডাকনা কেন।'

মণিকা বলে, 'বলব। আপনি যখন মাতলামি করবেন না, অভিনয় করবেন না, সহজ স্বাভাবিক ভাবে তুমি বলবেন তখন আমিও বলব।'

সঞ্জয় হেসে ওঠে, 'ও সব বাজে কথা তোমাকে কে বলেছে। কোন ভাবই দুনিয়ায় সহজ ভাব নয়। খানিকটা মাতলামি, খানিকটা ভালোলাগা, আর খানিকটা তার অভিনয়—এই নিয়ে প্রণয়।'

মণিকা বলে, 'আপনি বসে বসে বক বক করুন, আমি যাই।'

সঞ্জয় বলে, 'না না যেওনা। তোমাকে দেখে দেখে আমার কি মনে হয় জানো? ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আস্ত এক দেবী মূর্তি। তোমার সামনে দাঁড়ালে স্তব আমার মুখে আপনি বেরিয়ে আসে, পিছন থেকে কাউকে প্রম্পট করে দিতে হয় না।'

মণিকার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। দুরু দুরু করে বুক।

মণিকা বলে, 'কিন্তু আমার মত একটি খোঁড়া, সামান্য মেয়ের মধ্যে আপনি কি পেলেন?'

সঞ্জয় বলে, 'পেয়েছি হৃদয়। মণি, তুমি হৃদয় ধনে ধনী।' মাতাল এবার গুণ গুণিয়ে গান ধরে,—'প্রাণের মণি, তুমি আমার হৃদয় ধনে ধনী।'

মণি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালায়।

পান্নালাল বাবু বাইরে থেকে ডাকেন, 'মণি, মণি!'

মণি সাড়া দিয়ে বলে, 'যাই বাবা।'

মা আর বাবা দুজনে মিলে এক সঙ্গে তাকে তিরস্কার করতে থাকেন,

'ছি ছি ছি ওই মাতালটার সঙ্গে তুই কি কাণ্ড শুরু করলি বলতো ? তোর ভয় করেনা, লজ্জা করে না ?'

কুমুদিনী বলেন, 'কুটুম্ব বলে অনেক সয়েছি। কিন্তু যত সইছি, ততই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

পান্নালাল বলেন, 'রাস্তায় বেরোতে পারিনে। লোকে যা তা বলে। ওই মাতালটার তুই কেন অত সেবা যত্ন করবি শুনি ? ও আমাদের কে ?'

মণি জবাব দেয়, 'কেউ না বাবা, ও একজন রোগী। আমি সেই রোগের সেবা করতে যাই।'

কুমুদিনী বললেন, 'অবাক করলি তুই। যারা আজ সাধ করে রোগী হতে চায় তারা হোক। কিন্তু গেরস্থ ঘরের মেয়ে হয়ে তুই অমন সাধ করে মাতালের সেবা করতে পারবিনে। ওকে যেতে বলে দে।'

শেষ কথাগুলি সঞ্জয়কে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেন কুমুদিনী। মণিকার আর নিজের থেকে কিছু বলতে হয়না। খানিক বাদে সঞ্জয় বিদায় নেয়।

মাঝে মাঝে দুএকটি বিয়ের সম্বন্ধ এখনো আসে মণিকার। পাত্র হয় বোবা না হয় অন্ধ, না হয় প্রৌঢ় বিপত্নীক, একপাল ছেলে মেয়ের বাপ।

মণিকা প্রাণপণে বাধা দেয়, 'ফের যদি আমাকে বিরক্ত কর মা, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

কুমুদিনী বলেন, 'মুখপুড়ী, তাই তোকে একদিন মরতে হবে। ওদের তোর পছন্দ হয়না, তোর জন্যে কোন রাজপুত্তুর বসে তপস্যা করছে শুনি ?'

মণিকা মনে মনে বলে, 'রাজপুত্তুর আমার জন্য তপস্যা করবে কেন, আমিই রাজপুত্তুরের জন্যে তপস্যা করছি, চির জীবন করব।'

পান্নালাল বলেন, 'তাছাড়া ওই মাতাল বদমাসটার মধ্যে তুই কি দেখলি বল তো। ওর শুধু গায়ের চামড়াটাই সাদা, ভিতরটা কালো কুচ্ছিত।'

মণিকা বলে, 'আমি তা জানি বাবা।'

মনে মনে ভাবে ওর ভিতর বাহির যাতে সমান সুন্দর হয় সেই জন্যেই

তো মণিকার তপস্যা, তার সাধনা। সে তো আধা সুন্দরকে চায় না, পুরো সুন্দরকে চায়।

*   *   *

মাস ছয়েক বাদে আবার এক শীতের সন্ধ্যায় এসে হাজির হল সঞ্জয়। গায়ে একটা দামী কাশ্মীরী শাল জড়ানো। কিন্তু তা যেমন নোংরা, তেমনি দুর্গন্ধে ভরা। সার্জের পাঞ্জাবির দুটো পকেট অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। তা যে কিসে ভারি তা বুঝতে মণিকার মোটেই দেরি হলনা।

টলতে টলতে সঞ্জয় কোণের ছোট ঘরখানায় গিয়ে ঢুকল। তারপর খালি তক্তপোশখানার উপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

মণিকা বলল, 'ওকি উঠুন বিছানা পেতে দিই।'

সঞ্জয় বলল, 'সুন্দরী, এইতো আমার রাজশয্যা। আবার বিছানায় কি প্রয়োজন।'

মণিকা রাগ করে বলল, 'ছি ছি ছি আবার আপনি ওই সব খেয়ে এসেছেন?'

সঞ্জয় হেসে উঠল, 'মণিমালা, ওই সব খেয়ে আসিনে, আসবার জন্যেই খাই।'

এইটাই ওর একমাত্র সত্য কথা। বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ল মণিকার। একটু কাল তাকিয়ে থেকে মণি রূঢ় স্বরে বলল, 'না খেলে যদি আসতে না পারেন তা হলে আর এখানে আসবেন না।'

সঞ্জয় আবার হেসে উঠল, 'আমার মণি, আমার সোনা, তোমার মুখে কি কেবল না না না না। কিন্তু আমার মন যে মানেনা মানা। মানে না_না না না না।'

কথায় এবার সুর বসাল সঞ্জয়।

পান্নালাল চড়া গলায় ডাকলেন, 'মণি?'

'কি বলছ বাবা', মণি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'তুই ওই মাতালটাকে ফের এ বাড়িতে ঢুকতে দিলি কোন সাহসে! এ বাড়ি তোর না আমার?'

'তোমারই বাড়ি বাবা।'

'তাহলে এক্ষুণি ওকে বের করে দে।'

মণিকা বলল, 'রাতটা যাক কাল সকালে বের করে দেব। আর কোন দিন ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেবনা বাবা তোমাকে কথা দিচ্ছি।'

পান্নালাল বললেন, 'মাতালের সঙ্গে তুই মাতালনী হয়েছিস। তোর আবার একটা কথা।'

খেয়ে দেয়ে তাঁরা দুজন নিজেদের ঘরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বললেন, 'খবরদাব, ওকে আজ আর কিছু খেতে দিতে পারবিনে। যত্ন পেয়ে পেয়ে ওর লোভ বেড়ে গেছে। যে মাতাল যে বদমাস তার সঙ্গে আবার কুটুম্বিতা কিসের, ভদ্রতা কিসের। ঢের সয়েছি, আর না।'

মণিকাও সে রাত্রে কিছু খেলনা। বাবা মার অনুরোধ উপরোধে কান না দিযে ঘরে গিয়ে খিল দিল। কিন্তু খিল দিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারলনা। সঞ্জয়কে কিছু তারা খেতে না দিয়েছে না হয নাই দিল, কিন্তু এই কনকনে শীতের মধ্যে লোকটিকে অন্তত লেপ কাঁথা কিছু একটা দিযে আসা দরকার।

মণিকার ঘরে লেপ একখানা মাত্রই আছে, আর ছেঁড়া র‍্যাগ আছে একটা। র‍্যাগটা রেখে নিজের গাযের লেপখানাই মণিকা নিয়ে চলল সঞ্জযের জন্যে।

লোকটির ক্ষিধে তেষ্টা বলতে কি কিছুই নেই? শাল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছেই।

মণিকা তাকে ডেকে তুলল, 'উঠুন বিছানা পেতে দিই।'

সঞ্জয় বলল, 'আগেই বিছানা পাতবে কেন। কিছু খেতে টেতে দেবেনা?'

মণিকা বলল, 'কেন, যা খাচ্ছেন তাতে পেট ভরে না?'

সঞ্জয় বলল, 'তাতে পেটও ভরে না, মনও ভরে না। ও তো ভরবার জন্যে নয় মণি, খালি করে দেওয়ার জন্যে।'

মণিকা বলল, 'এও যদি জানেন তবে ও ছাইভস্ম খান কেন। ছেড়ে দিতে পারেন না? প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিন।'

সঞ্জয় বলল, 'প্রতিজ্ঞা রোজ করি, রোজ ভাঙিও। কিন্তু এই ভাঙা গড়ার খেলা রোজ ভালো লাগে না।'

মণিকা কাতর স্বরে বলে, 'আর ভাঙবেন না। এবার আমার গা ছুঁয়ে শপথ করে যান। আপনার এত রূপ, এত গুণ। কিন্তু এক দোষে সব যেতে বসেছে। আপনার খুঁত তো আমার খুঁতের মত নয়। একটু চেষ্টা করলেই আপনি নিখুঁত হতে পারেন।'

'পারি? তুমি সত্যি বলছ, পারি?'

'পারেন বই কি।'

সঞ্জয় কি বুঝল কে জানে, তক্তপোশ ছেড়ে উঠে এসে মণিকাকে হঠাৎ সে বুকে চেপে ধরল। তারপর গালে আর ঠোঁটে ঘন ঘন চুম্বন করতে করতে বলল, 'তুমি সত্যি বলছ আমি পারি?'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মণিকা; তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সঞ্জয়কে ঠেলে দিতে দিতে বলল, 'ছাড়ুন ছাড়ুন। কি বিশ্রী গন্ধ আপনার মুখে। ছি ছি ছি, ছাড়ুন ছেড়ে দিন।'

মাতাল তবুও ছাড়ে না। মণিকে আরো জোর করে আঁকড়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রাখে, এবার সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

তাকে ছাড়িয়ে নিলেন পান্নালাল নিজে এসে। চেঁচামেচি শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারপর ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন সঞ্জয়কে। তখন রাত প্রায় বারটা। মধ্যম গ্রামের পথে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। লোক চলাচলও আর নেই।

তারপর থেকে সঞ্জয় আর আসেনি। কিন্তু রোজ মণিকা জানলার কাছে একবার করে আসে। ঘরের কাজ সেরে বাগানের কাজ সেরে, বই পড়া সেরে, এখানে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকবার যথেষ্ট সময় হয় তার। শুকনো পা-টা দিনের পর দিন আরো যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন একেবারেই একটা পা সম্বল। তবু এই এক পা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে তার মোটেই কষ্ট হয় না। এখান থেকে সারা দিন পথের অনেক খানি দেখা যায়, পথের

মানুষ দেখা যায়। দুই পা-ওয়ালা চলন্ত মানুষ, আর ছুটন্ত বাস। ছুটতে ছুটতে সেই বাস কি একবারও ঐ মোড়ের মাথায় থামবে না। একবারও নেমে আসবেনা সেই মানুষটি যার কোন জায়গায় কোন খুঁৎ নেই, যে পুরোপুরি সুপুরুষ!

মণিকা তার কাছে আর কিছু চায়না, শুধু একটি বারের জন্যে তাকে দেখতে চায়। একটি বারের জন্যে শুধু তার একটি মাত্র কথা শুনতে চায় যে কথার মধ্যে মত্ততা নেই, ছলনা নেই, যে কথার মধ্যে সব আছে।

বিভ্রম

কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিল অরুণ। পাঁচটায় ব্যাঙ্কের চাকরি শেষ হয়েছে। পার্টটাইমের ছোট কাজটুকু বাকি। ধর্মতলা ন্যাশনাল ষ্টোর্সে হরেক রকমের চিঠিপত্রের জবাব লিখে টাইপ করতে করতে রাত নটা। তারপর ছুটি। আজ একটু সকাল সকালই বেরুতে পেরেছে ব্যাঙ্ক থেকে। ন্যাশনাল ষ্টোর্সের কাজটুকু কোন রকমে সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, ইচ্ছেটা তাই। কিন্তু কি হয়েছে আজ শ্যামবাজার ডিপোতে। মিনিট দশেক হতে চলল, না এল একটা ট্রাম, না কোন বাস। অরুণের বিরক্তি ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

'মাষ্টারমশাই না?'

নারীকণ্ঠে একটু চমকে উঠে অরুণ চোখ তুলে তাকাল। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ফর্সাপানা দোহারা চেহারার একটি মেয়ে কাছে এগুতে এগুতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে একটু পিছিয়ে গেল। মেয়েটি সুন্দরী। বেশেবাসে খুব পারিপাট্য না থাকলেও পরিচ্ছন্নতা আছে। চওড়া কালোপেড়ে একখানা তাঁতের শাড়ি পরনে, কানে লাল পাথর বসানো দুল। হাতে দুগাছি মোটা চুড। মাথায় আঁচল নেই, কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুরের আভাস দেখা যাচ্ছে। ঠিক চিনতে না পারলেও মেয়েটি যে তার পুরনো ছাত্রীদেরই একজন তা অনুমান করতে অরুণের দেরি হল না। সেও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এই যে, ভালো আছ?'

অনেকদিন আগে দেখা পরিচিত লোকের মুখ ভুলে যাওয়া অরুণের এক রোগ। তার জন্যে অনেকবার অনেক জায়গায় অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। দাম্ভিক বলে মনে করেছে লোকে। এই প্রাক্তন ছাত্রীটিকে তেমন ভুল ধারণা করবার সুযোগ সে দিতে চায় না।

বছর দশেক আগে অরুণ দিনরাত প্রাণপণে টিউশানি করত। চাকরিবাকরি

কিছু ছিল না। বছর কয়েক ধরে ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যাদানই ছিল একমাত্র জীবিকা। দুপুরবেলায় চাকরির চেষ্টা করে বেড়াত আর সকাল সন্ধ্যায় ছিল টিউশানি। টালা থেকে টালীগঞ্জ আর পাথুরেঘাটা থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে অন্তত দুমাসের জন্যেও অরুণ মুখুজ্যে গৃহ-শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত হয়নি।

মেয়েটি বলল, 'আপনি চিনতে পেরেছেন?'

অবশ্য তখনো মেয়েটির নাম কি মুখ অরুণ স্পষ্ট মনে আনতে পারেনি। কিন্তু সেকথা বলে মেয়েটিকে ক্ষুণ্ণ করতে তার বাধল। ওর কথার জবাবে অরুণ তাই হেসে বলল, 'বাঃ চিনব না কেন, অতদিন ধরে তোমাকে পড়ালাম আর চিনতে পারব না? তুমিই বরং চিনিনে চিনিনে করে চলে যাচ্ছিলে।'

মেয়েটি মৃদু হাসল, 'উল্টো আমাকেই দোষ দিচ্ছেন! আমিই তো প্রথমে চিনলাম, প্রথমে ডাকলাম আপনাকে। আপনারই তো চিনতে বেশি সময় লেগেছে।'

অরুণ একটু হাসল, 'তা লেগেছে। তোমার এত অদলবদল হয়েছে যে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক চিনে ওঠা শক্ত।' একটু থেমে অরুণ আবার হেসে বলল, 'বিয়ে হয়েছে কতদিন?'

মেয়েটি অরুণের দিকে একবার তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে নিল, 'তা বছর ছয়েক হয়ে গেল। ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকেছিলাম, বাবা আর পড়তে দিলেন না।'

অরুণ কৌতুকের স্বরে বলল, 'একেবারে বিয়ে দিলেন—না? বেশ বেশ, এইতো ভালো হয়েছে। তা কোথায় আজকাল আছ তোমরা? বাসা কোথায়?'

পরম পরিচিত আর অন্তরঙ্গ সুরে অরুণ জিজ্ঞেস করল। মেয়েটিকে চিনতে সে এখনো পারেনি। এতক্ষণে চিনবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি তার অগণিত ছাত্রীদের মধ্যে একজন, আপাতত এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। তারপর

ধীরে ধীরে সব বেরুবে। নাম-ধাম জাতি-গোত্র মেয়েটিব মুখ থেকেই পরে সব বের করে নিতে পারবে। এত তাড়া কিসের?

মেয়েটি বলল, 'বাসা কাছেই, এই একটু এগিয়ে বেচু চাটার্জী স্ট্রীটে।'

অরুণ বলল, 'তা হলে তো খুবই কাছে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখে আসব তোমাদেব গৃহস্থালী। আপত্তি নেইতো?'

মেয়েটি বলল, 'বাঃ আপত্তি কিসের? আজই আসুন না, এলে সত্যিই ভাবি খুশি হব। আজই চলুন।'

অরুণের ভারি অবাক লাগছিল। বড একটানা একঘেয়ে জীবনযাত্রা। সকালে উঠেই বাজারে ছুটতে হয়। তারপর মাথায় দু-ঘটি জল ঢেলে তাড়াতাড়ি নাকেমুখে কিছু গুঁজে অফিসে বেরুনো, রাত নটা পর্যন্ত খেটে ক্লান্ত দেহে বাসায় ফেরা। কোন রকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শ্রান্ত দেহকে গড়িয়ে দেয বিছানায়।

স্ত্রীর একটানা অভাব অভিযোগেব ফিরিস্তি আরম্ভ হবার আগেই ঘুমে চোখ জডিয়ে আসে। এই বাঁধা কটিনের নাগরিক জীবন। কোন দিক দিয়ে যে ঋতু পরিবর্তন হয়, পৃথিবীর রং বদলায় তার কিছু টের পাওযার জো নেই, কিন্তু আজকের বিকেলে ভুলে যাওয়া এই তন্বী ছাত্রীটির আন্তরিক আমন্ত্রণে অরুণের মনে হোল বহুকাল বহুযুগ বাদে হঠাৎ যেন বৈচিত্র্যের আমেজ লেগেছে। অভ্যস্ত বিবর্ণ জীবনে লেগেছে এক ছিটে রং।

এতক্ষণে এস্‌প্লানেডগামী ট্রাম আর বাস দুইই এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির কাছে বিদায় নিয়ে যে কোন একটায উঠে পডলেই হয়। কিন্তু অরুণ কোনটিতেই উঠল না। আজ না হয খানিকক্ষণ দেরি করেই যাবে ন্যাশনাল ষ্টোর্সে। মেয়েটির দিকে যিরে তাকিয়ে বলল, 'আজই যেতে বলছ?'

মেয়েটি আরও আগ্রহের স্বরে বলল, 'এলে সত্যি ভারি খুশি হব।'

অরুণ মন স্থির করে ফেলল, 'আচ্ছা চল, দেখেই আসা যাক তোমাদের বাসা।'

মেয়েটি বলল, 'চলুন'।

দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগল।

পথচারীদের কেউ কেউ আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল।

অরুণ মনে মনে একটু হাসল। দুজনের সম্পর্ক যে ছাত্রী-মাস্টারের তা হয়তো ওরা কেউ অনুমানই করছে না, হয়তো অন্যরকম কিছু আন্দাজ করছে। মেয়েটির ভাবভঙ্গিও ঠিক একেবারে ছাত্রীজনোচিত নয়। যদিও বয়সে অরুণের চেয়ে অন্তত সাত আট বছরের ছোট হবে, তবু কথাবার্তায় চালচলনে মেয়েটি সেই বয়সের ব্যবধান যেন অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। ও তো এখন আর অরুণের ছোট ছাত্রীটি নেই। এখন ও আর একটি সংসারের গৃহিণী—কর্ত্রী। জীবন সম্বন্ধে ওরও নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। পুরনো মাষ্টারমশাইএর সঙ্গে খানিকটা সমবয়সী বন্ধুর মত ব্যবহাব ও করবে বইকি।

হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি আলাপ করতে করতে চলল। কোথায় বাসা অরুণের, কোথায় চাকরি, কতদিন ধরে আছে ওই অফিসে। কোন স্কুল-কলেজের, কি পুরনো দিনেব পডাশুনাব কথা ওর বোধ হয় আর পাডবাব ইচ্ছে নেই, সে যুগ তো পার হয়ে এসেছে।

খানিকটা এগিয়ে বাঁ-দিকে মোড নিতে হল। তারপর একটা ব্যারাক-বাড়িব সামনে দাঁডিযে মেয়েটি বলল, 'আসুন, দোতলায় আমাদের ঘর। সিঁড়িতে আলো নেই, আপনার ভারি অসুবিধে হবে।'

অরুণ বলল, 'না না, অসুবিধার কি আছে।'

অরুণের আগে আগে সিঁডি বেয়ে উঠতে উঠতে মেযেটি গলা নামিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, 'এমন কৃপণ বাডিওয়ালা আমি আর দুটি দেখিনি। এত বলা-কওয়া, তবু কিছুতেই সিঁড়িতে একটা আলোর ব্যবস্থা করবে না।'

সিঁডির ডানদিকে পাশাপাশি দুখানা ঘর। তার একখানার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি কড়া নাডল। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা দোর খুলে দিয়ে তাড়াতাডি মাথায আঁচল টেনে একটু সরে দাঁড়ালেন, অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'ইনি কে বউমা।'

মেয়েটিও এবার মাথায় আঁচল তুলে দিল, তারপর দুজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার শাশুড়ী। আর ইনি আমার মাষ্টারমশাই। পথে আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।'

মহিলা বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

আমন্ত্রণ জানিয়ে মহিলাটি কিন্তু আর দাঁড়ালেন না, আরো ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি একটি গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

বেশ বোঝা যায় ঘরখানা চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের একটি বৈঠকখানা। উঁচু-নিচু খানকয়েক চেয়ার। একধারে লম্বা একটি বইয়ের র‍্যাক। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বড় একখানি ফোটো, জানলায়-দরজায় রঙিন পর্দা।

ভারি ভালো লাগতে লাগল অরুণের। অতিচেনা, অতি পরিচিত পরিবেশ, তবু ঠিক যেন একেবারে পরিচিত নয়। এরই মধ্যে বেশ একটু নতুনত্ব আছে, বৈচিত্র্য আছে। বন্ধু বান্ধবের এমন আরো অনেক বাড়িতে অরুণ হয়তো বহুবার গেছে। কিন্তু ঠিক এই বাড়িটিতে এর আগে সে তো একবারও আসেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য, মেয়েটির সঙ্গে এখনো সেই অপরিচয়ের রহস্য জড়িয়ে রয়েছে। তার ছাত্রী তাকে চিনেছে। কিন্তু অরুণ এখনো ওকে চিনতে পারেনি। অদ্ভুত ওর ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু কোথায় পড়িয়েছে মেয়েটিকে। ওর নামই বা কি। একবার মনে হচ্ছে রেণু। আবার মনে হচ্ছে সুধা। তারপর মনে হচ্ছে এর কোনটাই নয়, অন্য নাম। জায়গাটার কথাও ঠিক মনে পড়ছে না। একবার মনে হচ্ছে পার্কসার্কাসের সেই প্রগলভা ছাত্রীটি আর একবার মনে হচ্ছে না শ্যামবাজারে সেবার টেষ্টের পর যে দুটি বোনকে একসঙ্গে মাস তিনেক পড়িয়েছিল বোধ হয় তাদেরই একজন। আশ্চর্য, কিছুতেই ঠিকমত মনে আনতে পারছে না। টিউশানির দিনগুলি মোটে সুখকর ছিল না। হয়তো সেই জন্যেই ভুলে গিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু এতখানি আলাপ পরিচয়ের পর সে কথা আর বলা চলে না। কিছুতেই ওকে বুঝতে দেওয়া যায় না যে অরুণ এখনো ওকে চিনতে পারেনি কি মনে আনতে

পারেনি নাম। মেয়েটি কি ভাববে। বরং অরুণ আরও অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে আলাপ আরম্ভ করল, 'তুমিতো বেশ সুগৃহিণী দেখছি।'

মেয়েটি মৃদু হাসল, 'কেন। গৃহিণীপনার কি এমন দেখলেন।'

অরুণ বলল, 'ঘরখানা বেশ চমৎকার করে গুছিয়েছ।'

মেয়েটি তেমনি হেসে বলল, 'ইস ভারিতো গুছোন। আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।'

বলে মেয়েটি পাশের ঘরে চলে গেল। তারপর চার-পাঁচ বছরের একটি সুন্দর ছেলের হাত ধরে এনে অরুণের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'ভারি লাজুক। ওঘর থেকে আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করছে, কে মা, কে। কে আমি বলব কেন। নিজে এসে আলাপ পরিচয় করো।'

ছেলের দিকে হাসিমুখে তাকাল তার মা। ছেলে তখন মুখ ফিরিয়েছে। ছেলের মা এবার মৃদু ধমক দিল, 'ছিঃ হাবুল, অমন করে নাকি, নমস্কার করো মাষ্টারমশাইকে।'

হাবুল এগিয়ে আসতেই অরুণ তাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল, 'বেশ ছেলে, ভারি লক্ষ্মী ছেলে। তোমার নাম শুনলুম, তোমার বাবার নাম কি বলতো?'

হাবুল বলল, 'শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়।'

কিন্তু মার নাম তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না। তা ছাড়া হাবুল আর কোন জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগই দিল না অরুণকে। একটু বাদেই তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাল।

মেয়েটি আবার বলল, 'ভারি লাজুক। আপনি বসুন একটু। অন্যদিন এতক্ষণ বাসায় চলে আসেন। আজ কোথায় গেছেন কে জানে। এলে আলাপ পরিচয় হোত। বসুন, আমি আসছি এক্ষুণি।'

বলে মেয়েটি আবার ভিতরে চলে গেল। অরুণ উঠে গিয়ে র‍্যাকের বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। বই দেখাটা উদ্দেশ্য নয়, কোথাও মেয়েটির নাম লেখা আছে কি না অরুণ তাই খুঁজে বের করতে চায়, হয়তো নামের সঙ্গে [illegible]

সব মনে পড়বে। কিন্তু বেশির ভাগ বইয়ের পাতায় নাম রয়েছে বাইয়ের বন্ধু-বান্ধবদের, না হয় কোন লাইব্রেরীর। দু চারখানায় মাত্র গৃহস্বামীর নাম লেখা আছে।

হতাশ হয়ে অরুণ এসে ফের নিজের চেয়ারে বসল। একটু বাদেই মেয়েটি আবার এসে ঘরে ঢুকল। চা আর ডিমের অমলেট করে নিয়ে এসেছে প্লেটে করে। ছোট একখানা টুল নিজেই ঘরের কোণ থেকে টেনে নিয়ে তার ওপর সযত্নে রেখে দিল খাবার।

অরুণ বলল, 'আবার এসব কেন।'

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, 'কি আর এমন, নিন।'

বলে টুলটা আর একটু সামনে এগিয়ে দিল অরুণের।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাবি তৃপ্তি বোধ করল অরুণ। বেশ সুরভিত দামী চা। অনেকদিন এমন স্বাদ আব গন্ধ যেন ভাগ্যে জোটেনি। কাজ থেকে চুরি কবে নেওয়া অপূর্ব একটি সন্ধ্যাকে দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের ভিতর থেকে অরুণ যেন খুঁড়ে বের করেছে। এর মাধুর্যের শেষ নেই, রহস্যেরও অবধি নেই।

মেয়েটির দিকে তাকিযে অরুণ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো।'

একটু ইতস্তত করে আর একখানা চেয়ার কাছে এগিয়ে এনে মেয়েটি এবার তাতে বসে পড়ল।

অরুণ বলল, 'দেখ, আজকে তোমাদের এখানে এসে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।'

মেয়েটি বলল, 'কি কথা।'

অরুণ বলল, 'পড়াশুনার পাট চুকবার পরই মাষ্টারমশাইর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর ঠিক সৌহৃদ্য হয়। তোমাকে সত্যি কথা বলি, দিনরাত প্রাণের দায়ে টিউশানি করে গেছি। তাতে না পেয়েছি নিজে আনন্দ না খুশি করতে পেরেছি তোমাদের। বিদ্যেদান করতে করতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। বিরক্তির আর

সীমা থাকে নি। মাষ্টারমশাইএর সম্বন্ধে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো ধারণা হয়নি।'

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, 'কিন্তু আমাদের ধারণাও তো বদলাতে পারে, অন্ততঃ আমার তো বদলেছে। যখন নিজে ছাত্রী ছিলাম ভাবতাম সব দোষ মাষ্টারমশাইদেব। তাঁবাই অকাবণে বিবক্ত হন, বকাবকি কবেন, এমন কি ফাঁকি দেন, এখন নিজে মাষ্টাবি নিয়ে বুঝতে পাবছি অবস্থাটা। বুঝতে পারছি সময় সময় কত অবিচাব করেছি, কত অন্যায় ব্যবহাব কবেছি তাঁদের সঙ্গে।'

অরুণ বলল, 'তুমি নিজেও মাষ্টাবি নিয়েছ না কি? কই বলনি তো এতক্ষণ। কোথায়, কোন স্কুলে?'

মেয়েটি একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'এই কাছেই, বউবাজার বিদ্যাপীঠে। নতুন স্কুল, মাইনেও কম। তবু নিলাম। কিছুতেই যেন কুলিয়ে ওঠা যায় না। বসে থাকার চাইতে যেটুকু সাহায্য কবতে পারি—'

অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চযই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

অরুণ আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কি কবেন? চাকরি?'

মেয়েটি একটু হাসল, 'আবার কি।' তাবপর একটু থেমে বলল, 'আর লেখেন মাঝে মাঝে।'

অরুণ উৎসাহের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই নাকি? বইটই আছে?'

মেয়েটি বলল, 'এবাব বেরিয়েছে প্রথম উপন্যাস। দেখবেন?'

অরুণ পিঠ চাপডানোব সুবে বলল, 'নিশ্চয়ই, তোমার স্বামী বই লিখেছেন আব আমি দেখব না? শিগগিব নিয়ে এসো।'

মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একখানা বই নিয়ে এল।

'কি নাম?' অরুণ জিজ্ঞেস কবল।

মেযেটি বলল, 'কালস্রোত।'

তারপর অরুণেব দিকে এগিয়ে দিল বইখানা।

অরুণ উল্টেপাল্টে দেখল খানিকক্ষণ। আজকাল গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে তার আর বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু মেয়েটিকে খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'শুধু দেখে কি লাভ? পড়তে পারলে তো হোতো।'

লজ্জিত মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে পাশের ঘরে ছুটলো। ছোট্ট একটি ফাউণ্টেনপেন নিয়ে এসেছে এবার। তাবপর বইয়ের প্রথম পাতায় কি লিখতে গিয়ে লজ্জিতভাবে তাকাল অরুণের মুখের দিকে।

অরুণ হাসিমুখে বলল, 'কি ব্যাপার? একেবারে প্রেজেণ্ট করতে চাও নাকি? বেশ, বেশ।'

মেয়েটি বলল, 'আমাব অবশ্য প্রেজেণ্ট কববার কথা নয়। কিন্তু উনি তো এসে পৌছুলেন না। তা ছাড়া ফিরতে ফিরতে আজ হয়তো ওঁর অনেক রাত হয়ে যাবে।'

অরুণ বলল, 'না না, তুমি দাও। ওঁব সঙ্গে তো আমাব পরিচয় নেই, পরিচয় তোমার সঙ্গে, সম্পর্ক তোমার সঙ্গে। দেওয়ার যোগ্য অধিকারিণী তো তুমিই।'

বলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অরুণ ফের একটু হাসল।

মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু লিখতে গিয়ে ফের ইতস্তত কবতে লাগল মেয়েটি। তাবপর অরুণের দিকে তাকিয়ে আরক্ত মুখে হঠাৎ বলল, 'কিছু মনে করবেন না মাষ্টাবমশাই, আপনার নামটি যেন কি। নামটি ঠিক মনে আনতে পারছিনে।'

এবার বিস্মিত আর আহত হওয়ার পালা অরুণের। মুহূর্তকাল সে কোন কথা বলতে পারল না।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি বাগ করলেন? আমি কিছুতেই মনে আনতে পারছিনে। বাবা এত ঘন ঘন মাষ্টার বদলাতেন—'

অরুণ মুখে হাসি টেনে বলল, 'শুধু নাম কেন, মাষ্টারদের মুখও তোমার পক্ষে মনে রাখা শক্ত। তাই না? কিন্তু নাম দিয়ে কি হবে? লিখে দাও মাষ্টারমশাইকে।'

মেয়েটি বলল, 'শুধু তাই লিখব ?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, আর তোমার নাম।'

বলে অরুণ অদ্ভুত একটু হাসল।

মেয়েটি ভ্রূকুঞ্চিত করে চোখ তুলে অরুণের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, একটু যেন কি ভাবল, তারপর গোটা গোটা অক্ষরে মাষ্টারমশাইর নিচে নামটিও স্বাক্ষর করল।

অরুণ বইটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, আজ চলি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার আলোয় অরুণ এবার নামটা পড়ল, 'নীতা।'

তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনদিনই যে মাষ্টার-ছাত্রীর সম্পর্ক ছিল না, পরিচয় মাত্র ছিল না, অরুণের মত মেয়েটিরও নিশ্চয়ই তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তার মত মেয়েটিও নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে কেবল অভিনয় করছিল। আর শুধু তাই নয়, অরুণের অভিনয়ও তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের হয়তো টের পেতে বাকি থাকেনি। কিন্তু এই নামটি ? এটি কি ? সব বুঝে সব টের পেয়েও একজন অপরিচিত, অশোভন চরিত্রের পুরুষকে তার নিজের নাম সত্যিই কি মেয়েটি জানতে দিয়েছে ? না এ নামটাও বানানো ? সে কথা কোনদিনই জানা যাবে না।

টিকেট

অফিস থেকে বেরিয়ে মিশন রো-র মোড়ে এসে শ্যামবাজারগামী ট্রামখানার দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতল লক্ষ্য করেই এগিয়ে যাচ্ছিল শীতাংশু, হঠাৎ মানসী মিত্রের সঙ্গে একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। ছুটির পর সেও ট্রামের জন্যই অপেক্ষা করছে। শীতাংশুকে দেখে মানসী মৃদু হেসে পূর্বপরিচয়ের স্বীকৃতি দিল। তারপর চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। ভাবখানা এই—এবার শীতাংশু স্বচ্ছন্দে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে পাবে, মানসী আর ওদিকে তাকাবে না। কিন্তু যদিও আজ মাসের উনত্রিশে, যদিও পকেটে পারানির কড়ি মাত্র পাঁচটি পয়সাই সম্বল তবু আর সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠা চলে না, বরং মানসী মিত্রের চোখের সুমুখ দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে গিয়েই উঠতে হয়। নিজের পরাক্রান্ত পৌরুষের পরিচয় দিয়ে কনুইয়ের গুঁতোয় সহযাত্রীদের হটিয়ে স্থান করে নিতে হয় ভিতরে। কিন্তু যার জন্য এত পরাক্রম সে এদিকে তাকিয়েও দেখল না, বরং শীতাংশুই আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মানসীর পাশে ততক্ষণে স্যুট-শোভিত আর একটি চারুদর্শন যুবক এসে দাঁড়িয়েছে। আর তার সঙ্গে বেশ হেসে হেসে কথা বলছে মানসী। ইদানীং ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে নিতান্তই চোখাচোখি হয়ে গেলে মানসী সৌজন্যরক্ষার জন্য শুধু একটু হাসে, কথা আর বলে না। কিছু বিচিত্র নয়, স্কটিশে একসঙ্গে পড়ত। ডিবেটিং আর কলেজ ম্যাগাজিনের মারফৎ আলাপটা আরও কিছুদূর এগিয়েছিল। তারপর মানসী ঢুকেছে সরকারী দপ্তরে আর শীতাংশু অখ্যাতনামা এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। মানসী দেখে যে তাকে এখনও চিনতে পারে এই তো ঢের। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল শীতাংশু কিন্তু মন মানল না।

প্রথম শ্রেণীতে উঠেও শান্তি নেই, এপাশ ওপাশ থেকে সহযাত্রীদের ধাক্কায় বার বার স্থানচ্যুত হতে লাগল শীতাংশু। এবার মনে মনে আফসোস

হোল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিশ্চয়ই এত ভিড় হোত না, সেখানে হয়ত দিব্যি বসে যাওয়া চলত। জীবনের আর সবক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর লোক কম, দশটা পাঁচটার ট্রামই শুধু ব্যতিক্রম।

লালবাজার ছাড়িয়ে বউবাজার আর চিত্তরঞ্জন এভেনিয়ুর মোড়ে এসে দাঁড়ায় ট্রাম। একটি লোকও নামল না। বরং যারা বসে ছিল তারা দণ্ডায়মান সহযাত্রীদের দিকে একটু অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে আরও আয়েস করে বসল। কারও একটু উঠবার লক্ষণ নেই, আশ্চর্য, এরা সবাই কি একেবারে সীমান্তের যাত্রী?

ভিড়ের মধ্যে কণ্ডাক্টারের এতক্ষণ কোন পাত্তা মেলেনি। এবার তার মুখ দেখা গেল। সে এবার নডতে শুরু করেছে। হাত পাততে শুরু করেছে যাত্রীদের কাছে। মনটা আবার হাহাকার কবে উঠল শীতাংশুর—পাঁচটি পয়সার সবকটিই তুলে দিতে হবে ওর হাতে। যদি বুদ্ধি করে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠত তাহলে তিনটি পয়সাতে কাজ চলত। গলির মোড়ের দোকান থেকে তুপয়সার বিড়ি কিনে নিতে পারত শীতাংশু। কিন্তু কি কুক্ষণেই আজ চোখা-চোখি হয়েছিল মানসী মিত্রের সঙ্গে। আর হলেই বা কি। দেখিনি দেখিনি করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসেই তো দিব্যি উঠতে পারত শীতাংশু। যে সহপাঠিনী দেখা হলে মুখের কথাটি পর্যন্ত খসায় না, তার জন্য বোকা শীতাংশু কেন বিডি খাওয়ার তুটি পয়সা খসাতে গেল। নিজের মূঢ়তাকে, নিজের ভূয়ো প্রেষ্টিজ-বোধকে শীতাংশু নিজেই ধিক্কার দিল।

ঠিক সেই সময় কণ্ডাক্টার এসে দাঁড়াল শীতাংশুর পাশে, 'টিকেট'।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে অসীম মমতায় আনি আর ছিদ্র-গর্ভ পয়সাটির ওপর আঙুল বুলাল শীতাংশু। কিন্তু পকেট থেকে হাতটা তুলে আনতে না আনতেই অধীর কণ্ডাক্টার সেখান থেকে সরে গেল। শীতাংশু পয়সা বের করুক, ততক্ষণে তার আর বিশ-পঁচিশখানা টিকেট কাটা হবে।

কণ্ডাক্টার সরে যেতে শীতাংশু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—যাক, এবারের মত পাঁচটি পয়সা তো বেঁচেছে। সামনের দিক থেকে টিকেট কেটে কণ্ডাক্টার

ঘুরে আসতে না আসতে সে নেমে পড়বে। বাকি পথটুকু হেঁটে গেলেই হবে। এই তো শঙ্কর ঘোষ লেন। এমন প্রবৃত্তি শীতাংশুর এর আগে কোনদিনই হয়নি। ট্রাম বাসের কণ্ডাক্টারকে কোনদিন সে ফাঁকি দেয়নি। বরং কণ্ডাক্টার টিকেট চাইতে ভুলে গেলে শীতাংশু নিজে যেচে টিকেটের পয়সা দিয়েছে। দু একজন বন্ধু হাসি-ঠাট্টাও করেছে এ নিয়ে। বলেছে, 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও সশরীরে স্বর্গে যাবার আগে একবার নরক দর্শন করতে হয়েছিল, কিন্তু আমাদের কলির যুধিষ্ঠির শীতাংশুকে সেটুকুও আর দেখতে হবে না।' ওরা হাসে হাসুক। টিকেট না কেটে ট্রাম-বাসে যাওয়া শীতাংশুর ভদ্রতায় বাধে। ভারি ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়, তা ছাড়া দুনিয়া-জোড়া দুর্নীতির রাজ্যে কোথাও যখন একটু মাথা গলাতে পারেনি শীতাংশু, না আছে তেমন বুদ্ধি না প্রবৃত্তি, তখন কি হবে এই ট্রাম-বাসের দুচার পয়সা ফাঁকি দিয়ে। তার চেয়ে সততায় অনেক সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ যুক্তির মুখ হঠাৎ ঘুরে গেল শীতাংশুর। কেন ফাঁকি দেবে না? তাকে কি কেউ ফাঁকি দিতে বাকি রেখেছে? মাত্র আশি টাকা মাইনেয় দশটা ছটা সে খাটছে অফিসে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় ধার। ক্ষুরধার মুখ চলতে থাকে মল্লিকার। আজও রেশনের চাল ধার করতে হয়েছে প্রতিবেশী অমলবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে। ছ' আনার মধ্যে সারতে হয়েছে বাজার। মল্লিকা বলেছে, 'ও চাকরি তুমি ছেড়ে দাও, যে চাকরিতে পেটের ভাতের সংস্থান হয় না, সে চাকরি করে লাভ কি, ছি ছি। আজকাল অফিসের বেয়ারা-খানসামারাও আশি টাকার চেয়ে বেশি মাইনে পায়।'

শীতাংশু হেসেছে, 'পায় যদি আমি আটকাব কি করে বল।'

মল্লিকা জ্বলে উঠেছে, 'হেসো-না। হাসি কি করে আসে তোমার তাই ভাবি। একটি মাত্র ছেলে। তাকে ভালো করে খাওয়াতে পারিনে, পরাতে পারিনে আর তুমি হাস। এই তো অমলবাবু। চাকরি করেন না, বাকরি করেন না, তবু তো দিব্যি দুহাতে পয়সা আনছেন। যখনকার যা নিয়ম। সবাই পারছে আর তুমি পার না।'

স্ত্রীর কণ্ঠ ফের প্রতিধ্বনিত হোল শীতাংশুর মনে। ঠিক বলেছে মল্লিকা, সবাই যদি পারে শীতাংশুই বা পারবে না কেন। তার এই ভূয়ো নীতিবোধ নির্বোধ অক্ষমতারই নামান্তর, কোন মানে নেই, কোন মানে হয় না।

আবার এসে দাঁড়াল কণ্ডাক্‌টার 'টিকিট বাবু।'

খাকী পোষাকপরা লোকটাকে দেখে এবার সর্বাঙ্গ জলে উঠল শীতাংশুর। বিরক্তির ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে শীতাংশু এবার বাইরের দিকে তাকাল। তবু যেন বেয়াড়া কণ্ডাক্‌টারটা নডতে চায় না। কিন্তু শীতাংশু আজ নাছোড়বান্দা। কিছুতেই সে ঘাড় ফেরাল না, চোখ ফেরাল না। বাইরের সান্ধ্য শহরের রূপ যেন তাকে তন্ময় করেছে।

কণ্ডাক্‌টার সরে গেছে একটু বাদেই টের পেল শীতাংশু। তারপর আর ঝুঁকি না নিয়ে একটা ষ্টপেজ আগেই ট্রাম থেকে নেমে পডল।

পেরেছে। শীতাংশুও পেরেছে। অভূতপূর্ব উল্লাসে মন ভরে উঠল শীতাংশুর। কালো বাজারে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করেও কোন লাখপতি বোধ হয় এমন উন্মাদনার স্বাদ পায় না। কিছুই কঠিন নয়, চেষ্টা করলেই পারা যায়। শীতাংশুও পারবে। আরো পারবে। মল্লিকার আদর্শপুরুষ অমলবাবুর মত সেও অদূর ভবিষ্যতে পৌরুষের পরিচয় দিতে পারবে একদিন।

মোড়ের বিড়িওয়ালার দোকানের সামনে এসে আজ আর বিড়ি কিনল না শীতাংশু। বলল, 'ছুটো সিজার দাও তো।'

মাসের শেষে শীতাংশুবাবু কোন দিন সিগারেট কেনেন না। কোন দিন ধার বাকি রাখেন না দোকানে। ভারি হিসাবী মানুষ। বিড়িওয়ালা ফটিক দাস একটু অবাক হয়েই শীতাংশুর মুখের দিকে তাকাল, তারপর প্যাকেট থেকে ছুটো সিগারেট বের করে দিল।

পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তি ওডাবার উত্তেজনার স্বাদ পেতে পেতে পাঁচটা পয়সা ফটিকের হাতে তুলে দিল শীতাংশু, বলল, 'কই, দেশলাই দেখি।'

ফটিক বলতে যাচ্ছিল, 'ওই তো দড়িই রয়েছে বাবু।' কিন্তু তা না বলে দেশলাইটাই এগিয়ে দিল।

শীতাংশু মনে মনে হাসল, দিতেই হবে। দুপয়সার বিড়ি কিনলে কি আর দেশলাই চাইতে পারত শীতাংশু? না ফটিকই দিতে চাইত?

দেশলাই জেলে একটা সিগারেট ধরাল শীতাংশু। আর একটা সঞ্চিত রইল পকেটে। নৈশ ভোজন শেষ হলে শুয়ে শুয়ে ধরাবে। মনে পড়ল তিন চার দিনের মধ্যে প্রাণ-ধরে সে একটা সিগারেট কেনেনি। সংসারের জন্য এই চুল-চেরা হিসাবের কোন মানে হয় না। এত হিসাব করেও যখন সংসার চলে না, তখন হিসাব না করেই এবার দেখা যাক না। দেখবে, তার এমন বেহিসেবী চাল সত্ত্বেও সংসার দিব্যি চলছে।

অন্যদিন ঘরের দোরগোড়ায় জুতো খুলে ঢোকে শীতাংশু, আজ গট গট শব্দ করে জুতো সুদ্ধই ঘরে ঢুকল।

চার বছরের ছেলে বিনুকে শ্লোক শেখাচ্ছে মল্লিকা, 'নীতি এই যথা তথা, বল সদা সৎ কথা। আমরা ছেলেবেলায় পড়তাম। এখন আর সে বই দেখিনে।'

কিন্তু শীতাংশুকে দেখে বিনু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'বাবা এসেছে মা।'

মল্লিকা মৃদু হেসে বলল, 'এসেছেন তো করব কি?'

সন্ধ্যায় ফের স্নিগ্ধ হয়েছে মল্লিকার রূপ। ধোপা বুঝি কাপড় দিয়ে গেছে। আটপৌরে হলেও খয়েরীপাড় শাদা খোলের মিলের শাড়িতে বেশ মানিয়েছে মল্লিকাকে। হয়তো ধোয়া শাড়ি পরেই মল্লিকার মন আজ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। সকাল বেলায় 'ধোপা ধোপা' করেই ওর মেজাজ প্রথম বিগড়েছিল। খোঁপাটা আঁট করে বাঁধা। সিঁথিতে কপালে সিঁদুরের চিহ্ন। সামান্য এই সান্ধ্যপ্রসাধনে রূপ যেন বদলে গেছে মল্লিকার। স্বামীকে দেখে মাথায় আঁচল টেনে দিতে দিতে মল্লিকা মৃদু হেসে বলল, 'ব্যাপার কি, হঠাৎ যে এত সিগারেটের ঘটা। এবার উনত্রিশ তারিখেই মাইনে পেলে নাকি?'

শীতাংশু বলল, 'কেন, মাইনে না পেলে বুঝি সিগারেট খেতে নেই?'

আশ্চর্য, এই ধমক সত্ত্বেও মল্লিকা রাগ করল না, আগের মতই হেসে বলল, 'খেতে নেই আমি কি বলছি ? খাও না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আজ সোনা কাকা এসেছিলেন। তোমার কত প্রশংসা। আজকালকার দিনে তোমার মত নাকি মানুষ দেখা যায় না।'

শীতাংশু জামার বোতাম খুলতে খুলতে গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ।'

বিনু এবার এগিয়ে এল, 'আমার জন্য কি এনেছ বাবা।'

মল্লিকা সস্নেহে ধমক দিল, 'কি আবার আনবে রে দুষ্টু ছেলে।'

বিনু একবার মার মুখের দিকে তাকালে, আর একবার বাবার মুখের দিকে, তারপর পরম বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল, 'আজ বুঝি মাসের শেষ ? এখনও মাইনে দেয়নি, না ?'

মল্লিকা বলল, 'ছেলে একেবারে পাকা।'

মাইনে পেয়ে প্রথম দিকে ছেলের জন্য লজেঞ্চস, বিস্কুট কি কমলা লেবু কিছু না কিছু নিয়ে আসে শীতাংশু। শেষ দিকে আর আনা হয় না। মাসের প্রথম আর শেষের এই প্রভেদটা বুঝতে বাকি নেই বিনুর। নিজের অশোভন দাবীতে সে যেন নিজেই লজ্জা পেল। আত্মগোপনের জন্য মার পিছনে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে পড়ল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা টিকেট ?'

মাসের শেষের দিকে ছেলের জন্য যখন অন্য কোন উপহার আনতে পারে না, তখন ছেলে কিছু চাইবার আগেই পকেট থেকে ট্রাম কি বাসের টিকেটটা ছেলের হাতে তুলে দেয় শীতাংশু, 'নাও, জমিয়ে রাখ।' শীতাংশুকে আজ চুপ করে থাকতে দেখে বিনু আরও একটু এগিয়ে এল, 'কই বাবা টিকিট দাও।'

মল্লিকা হেসে বলল, 'আচ্ছা কণ্ডাক্টারের পাল্লায় পড়েছ, দাও এবার টিকিট।'

শীতাংশু গম্ভীর ভাবে বলল, 'টিকেট নেই।'

মল্লিকা উদ্বেগের স্বরে বলল, 'সেকি ! এতটা পথ হেঁটে এলে নাকি ?'

শীতাংশু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'টিকেট না কাটলেই বুঝি হেঁটে আসতে হয় ?'

মল্লিকা আর কোন কথা বলল না, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু শীতাংশুর ক্ষুদে কণ্ডাক্টারটি নাছোড়বান্দা, সে হাতখানা আরও একটু প্রসারিত করে দিয়ে ট্রামের কণ্ডাক্টারের গলার অনুকরণ করে পরম কৌতুকের ভঙ্গিতে আর একবার বলল, 'টিকেট বাবু।'

প্র তি ভূ

বিয়ের পর দ্বিতীয়বার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে ইজিচেয়ারে আয়েস করে শুয়ে স্ত্রীর ছবির এ্যালবামটা উলটে পালটে দেখছিল শুভেন্দু। হাতে কোন কাজ ছিল না, ঘরে কোন লোক ছিল না। শুধু তারা দুজনে। শুধু সে আর সেবা, শ্বশুর মশাই এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। সন্ধ্যার আগে ফিরবেনও না। শাশুড়ী রান্নাঘরে জলখাবার তৈরীতে ব্যস্ত। ন'দশ বছরের শালী রেবা ফুট ফরমায়েস খাটছে। কখনো পান জোগাচ্ছে, কখনো সিগারেট, কখনও চা। শুভেন্দু এক মুহূর্তও তাকে ঘরে থাকতে দিচ্ছে না। সে ঘরে থাকলে সেবাকে মাঝে মাঝে ছোঁয়া যায় না, যখন তখন যা তা কথা বলা যায় না; ওর নরম সুন্দর তুলতুলে হাতখানাকে তুলে নেওয়া যায় না নিজের হাতে। রেবা ঘরে থাকলে অনেক অসুবিধে।

স্বামীর চালাকি বুঝতে পেরে সেবা একটু হেসে বলল, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর, রেবার ওপর তোমার মোটেই দয়ামায়া নেই।'

শুভেন্দু বলল, 'আরও পাঁচ ছয় বছর পরে যখন ওর সম্বন্ধেও আমার দয়ামায়া জন্মাবে, হৃদয় আরও উদার হবে তখন হে হৃদয়েশ্বরী, তোমার নির্দয়তার সীমা থাকবে না।'

সেবা এবার বলল, 'তুমি বড় দুষ্ট।'

শুভেন্দু মৃদু হেসে এ্যালবামের দিকে চোখ ফেরাল। কত রকমের কত ফটোই যে কিশোর বয়স থেকে সেবা তার এ্যালবামে জড়ো করেছে তার আর ঠিক নেই। নিজের নানা বয়সের ছবি ছাড়াও আছে পারিবারিক গ্রুপ ফটো, রয়েছে পিকনিক পার্টির ছবি, স্কুল কলেজের সঙ্গিনী সহপাঠিনীর দল, দাদা বউদির যুগলরূপ। প্রকৃতিপ্রেমও নেহাত কম নয় সেবার। তার এ্যালবামে পূর্ব বাংলার শ্যামল সমতল শস্যভরা মাঠ, আছে পুরীর সমুদ্র,

রয়েছে দার্জিলিং থেকে তোলা শাদা বরফের শাদা চাদরে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

একে একে সবগুলি ছবির ইতিবৃত্ত, সবরকম আত্মীয়-স্বজনের নামধামের পূর্ণ বিবরণ সেবা স্বামীকে শুনিয়ে যেতে লাগল। সেবা নিজে ছবি তুলতে পারে না। বেশির ভাগ ফটোই তার দাদা সুপ্রিয়েব তোলা। কিছু কিছু বা তার অন্য দুএকজন বন্ধুর। সেবা পুরী কি দার্জিলিং কিছুই দেখেনি। সুপ্রিয় দেখেছে। যেখানে যেখানে গেছে বোনের জন্য ছবি তুলে নিয়ে এসেছে। কোন ছবিই এপর্যন্ত হারায়নি সেবা। কিছুই সে হারায় না। সিউড়ী কলেজে প্রফেসারি করে সুপ্রিয়। সস্ত্রীক সেখানেই থাকে। ছুটিছাটায় আসে কলকাতায়। সেবার বিয়েতে সপ্তাহখানেকেব জন্যে এসেছিল, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে শুভেন্দুর।

উল্‌টাতে উল্‌টাতে এ্যালবামেব একেবাবে শেষ পাতায় চলে এল শুভেন্দু, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'বাঃ, চমৎকাব ছবিখানা তো, এ কার ফটো?'

তেইশ চব্বিশ বছবের একটি পরম রূপবান্ যুবকের প্রতিকৃতি, বেশ লম্বা চেহারা, মাথায় ঘন কাল চুল, একটু যেন কোঁকড়ানো। সুন্দর প্রশস্ত কপাল, টানা টানা বড় বড় চোখ, দীর্ঘ সুগঠিত নাক, পাতলা ঘনবদ্ধ দুটি ঠোঁট। কোমল চিবুক। গায়ে শাদা একটি টুইলের সার্ট। বুকের ওপর দুখানি হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে সামনের দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে রয়েছে যুবকটি। যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে রূপময়ী পৃথিবীকে। দেখে খুশি হয়েছে।

শুভেন্দুও খুশি হল। ছবি থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'ভারি সুন্দর। তোমার এ্যালবামে যত ছবি দেখলাম তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর। আসলে তুলনা করলে দেখা যায় মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের রূপই পৃথিবীতে বেশি। কারণ তার রূপের মধ্যে একটা রহস্য আছে। কে এ বলতো?'

স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাল শুভেন্দু।

কিন্তু সেবা ততক্ষণে চোখ নত করেছে। আর সুন্দর সুগৌর মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ।

সেবা আস্তে মৃদু স্বরে বলল, 'ও কেউ না। ছবিটা দাও আমাকে?'

স্ত্রীর শেষ কথাটা কানে তুলল না শুভেন্দু, স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'কেউ না মানে? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একজন ভদ্রলোক। থিয়েটারের হিরো সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে এ? তোমার কোন আত্মীয়? মাসতুতো পিসতুতো কোন ভাই?'

সেবা বলল, 'না।'

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তবে? কোন বন্ধু? আগে দাদার বন্ধু ছিল তার পরে তোমার?'

অদ্ভুত একটু হাসল শুভেন্দু।

সেবা ঘাড় নাড়ল, 'না, তাও না।'

'তবে কে এ লোকটি?'

সেবা বলল, 'আর একদিন বলব, আর এক সময়।'

কিন্তু সময় দিতে মোটেই রাজী নয় শুভেন্দু। বলল, 'না, আমি এখনই শুনতে চাই। সব খুলে বল আমাকে। গোপন করলে ফল আরও খারাপ হবে।'

শাসনের স্বর ফুটে উঠল শুভেন্দুর গলায়। সেবা তবু চুপ করে রইল।

খাবারের থালা নিয়ে শাশুড়ী সরোজিনী ঘরে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে জলের গ্লাস হাতে রেবা। অনেক যত্ন করে নানারকম খাবার তৈরী করেছেন সরোজিনী। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি, সিঙ্গারা, ডিমের হালুয়া, দুতিন রকমের মিষ্টি। কিন্তু শুভেন্দু বলল তার মোটেই ক্ষিদে নেই, তার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর যদি বা কিছু মুখে তুলল, ভারি বিস্বাদ লাগল খাবারগুলি। সুরভিত চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে একবার ছুঁইয়েই তাড়াতাড়ি রেখে দিল টেবিলের ওপর। পৃথিবীর সব কিছু কটু স্বাদে ভরে গেছে।

সরোজিনী বললেন, 'হলো কি তোমার? হলো কি তোমাদের?' কিন্তু কেউ কোন সদুত্তর দিল না।

সন্ধ্যার শো-তে শ্যালিকা আর স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল শুভেন্দুর। সে প্রোগ্রাম বাতিল হলো। একা একা বেড়াতে বেরোল গড়ের মাঠের দিকে। তাও ভাল লাগল না। ভাবল সেবাকে রেখে ফিরে যায়

নিজেদের শ্যামবাজারের বাড়িতে। তাও পারল না। বুক পকেট থেকে অজ্ঞাতনামা সেই সুপুরুষ যুবকটির ফটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বের করে দেখল, বার বার রেখে দিল পকেটে। শুভেন্দুর বুঝতে কিছু আর বাকি নেই। সেবা বলবে আর কি। বলবার তার আর কি-ই বা আছে। শুভেন্দুর মনে পড়ল সেবার সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে শুভেন্দুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় তাকে নিষেধ করেছিল। মেয়েটির সম্বন্ধে নানারকম কানা-ঘুষা নাকি তিনি ওদের পাড়া থেকে শুনে এসেছেন। কিন্তু শুভেন্দু গ্রাহ্য করেনি। অবিবাহিতা সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ওরকম মিথ্যে অপবাদ রটে। শুভেন্দু নিজে দেখে ওকে পছন্দ করেছে। ওর গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আই. এ. পর্যন্ত পড়েছে সেবা। বিয়ের পরও ওকে বি. এ. পাশ কবিয়ে নেওয়ার কথা মনে মনে ভেবেছে। কিন্তু এখন সব ভাব ভাবনা গুলিয়ে গেল। মনে অনুতাপ হলো কেন সেই আত্মীয়ের কথা তখন শুনল না। সেই সুপুরুষ যুবকটির ছবিখানা বুক পকেটের ভিতরে থেকে সমস্ত বুকটাকে যেন জ্বালিয়ে দিতে লাগল। এখন ছবিখানাকে তত সুন্দর মনে হলো না। খুঁটিয়ে খুঁটিযে দেখতে গিয়ে অমেক খুঁত বেরোল, অনেক ত্রুটি বেরোল। লোকটির চোখে মুখে পরিষ্কার লাম্পট্যের ছাপ দেখতে পেল শুভেন্দু।

তবু ফিরে এল মলঙ্গা লেনের শ্বশুর বাডিতে। হরিপ্রসাদ তখন সকালের কাগজ রাত্রে খুলে বসেছেন। অফিসের তাড়ায় দিনে কাগজ পড়বার তিনি সময় পান না। রাত্রে বসে ধীরে সুস্থে পড়েন, খবব আর সম্পাদকের মন্তব্য নিয়ে নানারকম আলোচনাও করলেন, জামাইকে ডাকলেন সেই আলোচনার বৈঠকে। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে শুভেন্দুর কোন আগ্রহ ঔৎসুক্য নেই, দশের দুর্দশায় তার কোন সহানুভূতি ধরা পডল না। একটু বাদেই মাথা ধরেছে বলে সে উঠে পড়ল।

রাত্রেও পঞ্চব্যঞ্জনের ভাতের থালা সামনে এগিয়ে দিলেন সরোজিনী। এই রেশনের দিনে রাত্রে ভাতের থালা দিতে পারা সহজ-সাধ্য নয়। পঞ্চব্যঞ্জনের আয়োজনও অবস্থায় কুলোয় না। তবু শুভেন্দু প্রায় কিছুই খেল না। সব

ফেলে রেখে উঠে এল। শ্বশুর শাশুড়ী বিমূঢ় বিস্ময়ে চুপ করে রইলেন। এত যে বক বক করে রেবা, সেও যেন কথা ভুলে গেছে। ধারে কাছে সেবার দেখা মিলল না।

সাড়া মিলল রাত্রে। নেটের মশারির মধ্যে স্বামীকে ঘুমন্ত ভেবে সে যখন দোরে খিল দিয়ে স্যুইচ অফ করে বিছানায় ঢুকতে যাচ্ছে শুভেন্দু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, বলল, 'আগে আমাকে সব খুলে বল, তারপর এসো এখানে।' সেবা অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে একটুকাল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আজই, সব শুনতে চাও?'

শুভেন্দু বলল, 'আজই, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি করতে চাইনে।'

মশারির খানিকটা তুলে ফেলে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল শুভেন্দু। বসে সিগারেট ধরাল। আর তার পায়ের কাছে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল সেবা। হেলান দিয়ে আয়েস করে নয়। সোজা হয়ে বসল। তারপর ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে সেই অজ্ঞাতনামা রূপবান্ যুবকের পরিচয় উদ্ঘাটন করতে লাগল।

সেবারা তখন থাকত চেতলায়। পড়ত প্রভাবতী গার্লস হাইতে। ফার্স্ট ক্লাসে। কত আর বয়স হবে তখন। বছর পনের যোল। কিন্তু বাড়ন্ত গড়ন ছিল বলে লোকে একটু বেশিই আন্দাজ করত। স্কুলটা ছিল বাসা থেকে বেশ একটু দূরে। মিনিট দশ বার পথ হাঁটতে হত। পথটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে খানিকটা অপথ দিয়ে হাঁটত সেবা। একটা পোড়ো বাগান বাড়ির ভিতর দিয়ে, পানা ঢাকা মজা-পুকুরের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়ত বড়-রাস্তায়। স্কুল ছিল সকালে। ফার্স্ট বেঞ্চে নিজের জায়গাটিতে সবাইর আগে গিয়ে বসবার জন্যে সেবা একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ভোরে উঠতে তার ভাল লাগত। রাস্তায় একা-একা হাঁটতে ভালো লাগত। পথে কারো সঙ্গে দেখা শোনা হয়ে যায় তা সে চাইত না। ছেলেবেলা থেকেই তার এমন একটু কুনো স্বভাব ছিল। কি ছেলে, কি মেয়ে কারো সঙ্গেই সে তেমন

মিশত না, আলাপ পরিচয় করত না। শুধু বই নিয়ে থাকতে ভালোবাসত। কেবল পাঠ্য বই নয়, নাটক নভেলের সংখ্যাই তার মধ্যে বেশি থাকত। ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে কেউ বলত একাচোরা, কেউ বলত অহঙ্কারী, দেমাকী।

একদিন সে সদ্য শেষ করা একখানা নভেলের তরুণ নায়কের কথা ভাবতে ভাবতে স্কুলের পথে হেঁটে চলেছে হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ডাকল, 'ও খুকি, শোন।'

দ্বিতীয় বারের ডাকে সে ঘাড ফিরিয়ে দেখল, বেডাবার ছড়ি হাতে এক বুড়ো ভদ্রলোক। মাথায় অর্ধেক টাক, বাকি অর্ধেকে কাঁচা-পাকা চুল। মুখখানা নিখুঁত কামানো, তবু কোঁচকানো চামড়াটা বেশ চোখে পড়ে। গায়ে শাদা আদ্দির পাঞ্জাবি। ফুল কোচা পায়ের পাম-শু পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক বেশ সৌখীন। কিন্তু বয়স বছব ষাট পঁয়ষট্টির কম হবে না।

কাহিনীর মাঝখানে শুভেন্দু বাধা দিয়ে বললে, 'সে বুড়োব কথা কে শুনতে চাইছে ?'

সেবা বলল, 'আগে শোনই।'

ভদ্রলোক ততক্ষণে সেবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেবার দিকে একটা লাল রঙের পেনশিল এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পেনসিলটা কি তোমার খুকি ? রাস্তায় পডে ছিল।'

ব্যাকবণ কৌমুদীখানার মধ্যে পেনসিলটা গুঁজে ঐসেছিল সেবা। অসাবধানে পডে গেছে দেখে একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পেনসিলটা আমারই। কিন্তু আমার নাম খুকি নয়। কেউ আমাকে খুকি বলে ডাকুক তা আমি পছন্দও করিনে।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'তাই নাকি ? দেখ কোন কিশোরী মেয়েকে খুকি বলতে আমারও যে ইচ্ছা করে তা নয়। কিন্তু তোমার নাম তো আমি জানিনে, নাম কি তোমার।'

ছেলে ছোকরা কেউ হলে চট করে নিজের নাম বলতে হয়ত ইতস্তত করত

সেবা। তাছাড়া জিজ্ঞেস করতে সে হয়ত সাহসও পেত না। কিন্তু এই বুড়ো ভদ্রলোককে নিজের নাম বলতে সংকোচ কিসের। 'আমার নাম সেবা সেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বাঃ, তোমার মতই সুন্দর তোমার নাম। আর বেশ অনুপ্রাসও রয়েছে। আমিও অনুপ্রাস থেকে একেবারে বঞ্চিত নই। আমার নাম আদিত্য দে।'

সেবা হেসে বললে, 'আপনার নামও তো বেশ ভালো।' বলে স্কুলের দিকে পা বাড়াল সেবা।

তারপর থেকে রোজই প্রায় একই জায়গায় আদিত্যবাবুর সঙ্গে দেখা হতে লাগল সেবার। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল না সেবা। আদিত্যবাবুও রোজ ভোরে এই পথে বেড়াতে বেরোন, সেবাও স্কুলে যায়, দেখা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কোন সংকোচের কারণ ও খুঁজে পেল না, কারণ আদিত্যবাবুকে অনেকটা তার দাদুর মত দেখতে। বয়সও তাঁর মতই, কি তাঁর চেয়েও বেশি। দাদু থাকেন এলাহাবাদে। ন মাসে ছ মাসে একবার করে আসেন। দুচার দিনের বেশি থাকতে পারেন না।

যে কদিন থাকেন নাতি-নাতনীকে নিয়ে খুব আনন্দ আহ্লাদ করে যান। তাঁর সময়ের পরিমাণটা এতই অল্প যে তাতে সেবার সাধ মেটে না, মন ভরে না। স্কুলের পথে নিত্যকার একটি দাদুকে পেয়ে সেবার বেশ ভালই লাগতে লাগল।

আদিত্যবাবু অনেকটা পথ সেবাকে আজকাল এগিয়ে দিয়ে আসেন। সেবা আগে আগে যায়, আর পিছনে পিছনে নানারকমের শ্লোকের গুঞ্জনধ্বনি ওঠে। যেন মৌমাছির ঝাঁক গুণ গুণ কবছে। সে গুণগুণানি কখনো ইংরেজী ছন্দের, কখনো বাংলা, কখনো সংস্কৃতের।

লাল পেনসিলটা রোজ পড়ে যায় না সেবার। কিন্তু রোজই কিছু না কিছু ফুল সেবাকে তাঁর হাত থেকে নিতে হয়। সে ফুলের রঙ কোনদিন লাল, কোনদিন নীল, কোনদিন হলদে। সংখ্যায় বেশি নয়, অনায়াসে খোপায় গুঁজে রাখা যায়।

সহপাঠিনী শিপ্রা তা দেখে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, 'এত ফুল তুই পাস কোথায় বল তো ?'

শিপ্রাকে চটাবার জন্যে, রাগাবার জন্যে, হিংসেয় জ্বলে মরবার জন্যে সেবা জবাব দেয়, 'কোথায় আর পাব। লাভার এসে দিয়ে যায়।'

শিপ্রা চোখ ছানাবডা করে বলে, 'বলিস কি ? তলে তলে এত ? নিজের হাতে ফুলগুলি খোঁপায় গুঁজে দেয় নাকি ?'

সেবা বলে, 'নিজের হাতে দেয় না কি তোর বাডিতে হাত ধার করতে যায় ?'

শিপ্রা বলে, 'দাঁডা, আমি সবাইকে বলে দেব। দিদিমণিদেরও বলব।'

'বেশতো বলিস।' সেবা হাসে।

ভালো ছাত্রী আর সৎস্বভাবের মেয়ে বলে স্কুলে সুনাম আছে সেবার। বছর বছর তাব জন্যে অনেকগুলি করে প্রাইজ পায। শিপ্রাকে তার ভয় নেই।

একদিন আদিত্যবাবুকে সেবা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এত ফুল আর এত শ্লোক আপনি রোজ বোজ কোত্থেকে পান ?'

আদিত্যবাবু হেসে বললেন, 'ফুলগুলি বাগানের। শ্লোকগুলি অবশ্য বাগানে পাওয়া যায় না। বইয়ের ভিতর থেকে কুডিয়ে নিতে হয়।'

সেবা বলল, 'আপনার বুঝি অনেক বই আছে ?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'তা আছে দুচারখানা।'

সেবা বলল, 'আমাকে দেবেন পডতে ? স্কুল লাইব্রেরীতে তেমন ভালো বই নেই। আর সব বই ইস্যুও করে না।'

আদিত্যবাবু বললেন, 'দিতে পারি। তুমি যদি নিজে গিয়ে নিয়ে আস।'

'এক্ষুণি গেলে এক্ষুণি দেবেন ? কত দূর আপনার বাড়ি ?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'এই তো কাছেই। মিনিট পাঁচেকের পথ।'

তাঁর হাত ঘডিতে সময়ের হিসেব মিলল। সেবাদের স্কুল আরম্ভ হতে আরও আধঘণ্টা দেরি আছে। আজ না হয় কয়েকটা বেঞ্চ পিছনে গিয়েই বসবে সেবা। তবু কতকগুলি বইতো নিয়ে আসতে পারবে।

লালরঙের সুন্দর ছোট একটি বাড়ি। ঠিক যেন ছবির মত দেখতে। সামনে সবুজ ঘাসের লন। বারান্দায় নাম না-জানা নানা রঙের ফুলের টব। খাঁচায় ঝুলছে সবুজ রঙের একটি টিয়া। সেবা ভিতরে ঢুকতেই মিষ্ট করে ডেকে উঠল।

সেবা জিজ্ঞেসা করল, 'ও কি বলছে?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'তোমার নাম ধরে ডাকছে?'

সেবা লজ্জিত হয়ে বলল, 'বা রে আমার নাম ও শুনল কার কাছে।'

আদিত্যবাবু হেসে বললেন, 'কি জানি কার কাছ থেকে শুনেছে।'

সেবার প্রথমে বিশ্বাস হল না। কিন্তু টিয়াটা এরপর যতবার ডাকতে লাগল সেবা স্পষ্ট নিজের নামই শুনতে পেল।

বাড়িতে খানতিনেক ঘর। বড় বড় সোফা ইজিচেয়ারে সাজানো। আর একঘরে তিন চারটে কাঁচের আলমারি ঠাসা বই। সেবা সেদিকে একবার লুব্ধ চোখ বুলিয়ে নিল। কিন্তু হাত দিতে সাহস পেল না। বেশির ভাগই মোটা-মোটা ইংরেজী বই।

সেবা বলল, 'সব তো দেখলাম, কিন্তু আর সব কই?'

'আর সব আবার কে আসবে?'

'কেন আপনাব ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীরা?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'আমাব স্ত্রী এ-পর্যন্ত আসে নি। তাই তারাও কেউ আসতে রাজী হয় নি।'

সেবা বলল, 'ও আপনি বুঝি বিয়ে করেন নি? কেন করেননি?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'সে অনেক কথা। পরে তোমাকে ধীরে ধীরে বলব।'

অনেক না শুনলেও দুচারটে কথা তাঁর কাছ থেকে না শুনে ছাড়ল না সেবা। আদিত্যবাবু রিটায়ার্ড সাবজজ। বছর দুই ধরে এই বাড়িতেই আছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ নেই। দূর সম্পর্কের যারা আছে তারা দূরেই থাকে। এখানে আদিত্যবাবুর একটি চাকর শুধু সম্বল। সে-ই রান্না-বান্না

করে। শুনে সেবার ভারি মায়া হলো। আহা, তার দাদুর যদি এই অবস্থা হতো তিনি কি করে টিকতেন।

আদিত্যবাবু নিজের হাতে ষ্টোভ জ্বেলে তাকে চা আর ডিমের অমলেট করে খাওয়ালেন। কিছুতেই বারণ শুনলেন না। অগত্যা সেবাও তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তারপর দুতিন খানা বই নিয়ে বেরোবার সময় দেখে বেলা নটা বেজে গেছে। আহা, স্কুলটা কামাই হলো। জিভ কাটল সেবা। তবে তেমন যেন দুঃখ হলো না। কিন্তু দুর্ভোগ হলো বাড়িতে গিয়ে। মা একেবারে চটে আগুন, 'হতভাগী, কোথায় গিয়েছিলি তুই ?'

'কেন, আদিত্যবাবুর বাড়িতে।'

সেবার মা বললেন, 'তা হলে লোকে যা বলে বেড়াচ্ছে সবই ঠিক ? হতচ্ছাড়ি, মরবার আর তুই জায়গা পেলিনে ? ওই বুড়োর কাছে গেলি মরতে ?'

সেবা বলল, 'এসব তুমি কি বলছ মা, বুড়ো মানুষ! তোমার বাপের বয়সী।'

মা বললেন, 'আমার বাপের বয়সী কেন, আমার বাপ আসুক না। তাকেই বা বিশ্বাস কিসের ? চিতেয় না ওঠা পর্যন্ত পুরুষ মানুষে সব পারে। তা ছাড়া ও বুড়োর তো পাড়া ভরে বদনাম। অল্প বয়সী মেয়েদের পিছনে পিছনে ও ঘুরে বেড়ায়।'

সেবা বলল, 'ছি ছি ছি, চুপ করো তুমি।'

শুধু মা নয়। বাবা আর দাদা দুজনেই শাসন করলেন সেবাকে। বিশ্রী গ্লানিতে সেবার মন ভরে উঠল। ছি ছি ছি শেষ পর্যন্ত একটা বুড়োর সঙ্গে তার বদনাম রটল। কোন কিশোর নয়, কোন সুদর্শন তরুণ যুবক নয়, তার জীবনে কলঙ্কের কালি লেপে দিল পাকা মাথা একটা বুড়ো!

বইগুলি পরদিনই স্কুলে যাওয়ার পথে আদিত্যবাবুকে ফেরৎ দিল সেবা। তিনি বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে গেল ?' সেবা কোন জবাব দিল না। তিনি ফুল দিতে গেলেন, সেবা তাঁর হাত থেকে ফুলগুলি কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল।

তিনি বললেন, 'হলো কি তোমার ?'

সেবা বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনি লোক ভালো নন। আপনার দুর্নাম আছে। সেই দুর্নাম আপনি আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। আপনার লজ্জা করে না কথা বলতে ?'

আদিত্যবাবু ম্লান মুখে চলে গেলেন।

সেবা আর সে পথ দিয়ে হাঁটল না, অন্য ঘুর পথে যেতে লাগল, কিন্তু দেখা গেল সে পথেও আদিত্যবাবু আছেন, কাছে আসতে সাহস পান না, দূরে দূরেই ঘোরেন। রোজ একবার করে যেন সেবাকে তাঁর দেখা চাই। লোকটি যে খারাপ তাতে এবার আর সেবার সন্দেহ রইল না। ঘৃণায় বিদ্বেষে আর বিতৃষ্ণায় তাব মন ভরে উঠল। এদিকে স্কুলটাও ফিস্ ফিস্ গুজ গুজ শব্দে ভরে উঠেছে, ছাত্রীরা কানাকানি করে। টিচাররা এক অদ্ভুত চোখে তাকান তার দিকে, স্কুল থেকে তার নাম কাটিয়ে দেওয়ার আলোচনাও নাকি চলতে লাগল। অস্বস্তিতে নিজের অস্তিত্ব অসহনীয় হয়ে উঠল সেবার।

শিপ্রা বলল, 'চিনলুম এবার তোর লাভারকে। তা ওই বুড়োর ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে ক-হাজার টাকা আদায় করেছিস ভাই, তোর বাবা নাকি বাড়ি করছেন ?'

শুধু শিপ্রার মুখেই নয়, পাড়ার আর সব প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী পুরুষেব মুখে মুখেও কথাটা শোনা যেতে লাগল, সেবাব গরীব বাবা মা নাকি নিজেরাই টাকার লোভে মেয়েকে এই বুড়োর কাছে পাঠিয়েছেন।

দূর থেকে ফেব একদিন কাছে এগিয়ে এলেন আদিত্যবাবু। সেবাকে নিরালায় পেয়ে বললেন, 'তোমাব দুর্ভোগের কথা আমাব কানে গেছে।'

সেবা বলল, 'এবার বুঝি চোখে দেখতে এসেছেন ?' আদিত্যবাবু বললেন, 'তা নয়। ভেবেছি আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি যদি রাজী হও। আমি তোমার বাবাকে বলি।'

অপমানে সমস্ত অন্তরটা জ্বলে যেতে লাগল সেবার, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা, এর জবাব আপনাকে আমি পরে দেব।'

বাড়ি এসে ভাবতে লাগল কি করা যায়। বাবাকে মাকে বললে তারা আরো হৈচৈ করবেন, দাদাকে বলে পাড়ার ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে আচ্ছা করে লোকটাকে মার দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাও নয়, নিজের হাতেই লোকটার শাস্তির ব্যবস্থা করবে সেবা, নিজে না মারলে তার বুকের জ্বালা মিটবে না, জুতো, চাবুক নানারকম হাতিয়ারের কথাই মনে হলো সেবার কিন্তু কোনটাই ঠিক মনঃপূত হলো না। তবু তার মতলব ভাঁজার ফন্দি আঁটার বিরাম রইল না।

পবদিন আদিত্যবাবুর সাথে ফেব দেখা। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ঠিক করলে।'

সেবা বলল, 'আর মাসখানেক অপেক্ষা করুন, আমাব পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপরই কথা পাকাপাকি হবে।'

আদিত্যবাবু বিশ্বাস করলেন, খুশি হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

প্রেমে পডলে লোকে বোকা হয়, পাগল হয়, আব যারা বুড়োবয়সে প্রেমে পড়ে তারা দুইই হতে পাবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেবার মনে শান্তি এল না। লোকটাকে শাস্তি দেওয়া হলো না তো!

দিন কয়েক বাদে সেবার বাবা আর মা হাসপাতালে দূর সম্পর্কের এক কাকাকে দেখতে গেছেন, দাদা বয়েছে ডিউটিতে, রেবাকে ঘরে থাকতে বলে সেবা বিকেল বেলা আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পডল, বড একজন নেতা পার্কে বক্তৃতা করতে এসেছেন, পাড়ার লোকজন সবাই সেখানে ভেঙে পড়েছে। পা টিপে টিপে সেবা গিয়ে উপস্থিত হলো আদিত্যবাবুর বাড়িতে, টিয়েটা আজও তার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু সে ডাকে কানে যেন ছুঁচ বিঁধল সেবার। আদিত্যবাবু খুশি হয়ে বললে, 'তুমি এসেছ?'

সেবা রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'হ্যাঁ, আসুন, আমার সময় নেই, বাবা মা এসে পড়লে মুশকিল হবে।'

আদিত্যবাবু বললেন, 'কি ব্যাপার কি।'

সেবা বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে, বলছি।'

তারপর যেখানে আদিত্যবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সেই পোড়ো বাগানবাড়ির মধ্যে মজা পানাভরা পুকুরটার কাছে গিয়ে বলল, 'শুনুন, এই পুকুরটার মধ্যে আমার হাতের আংটি খুলে পড়ে গেছে। ঘাটের কাছেই পড়েছে, আপনি দয়া করে তুলে দিন, বাবা মা জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না।'

আংটিশূন্য অনামিকাটা উঁচু করে দেখাল সেবা।

আদিত্যবাবু বললেন, 'কি করে পড়ল ?'

সেবা বলল, 'লাল সাপলা ফুলটা তুলতে গিয়েছিলাম। আংটিটা টুক করে পড়ে গেল।'

আদিত্যবাবু বললেন, 'কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলা,—চাকরটা আসুক না হয়।'

সেবা তাঁকে প্রায় গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'না না ওঁরা এসে পড়বেন, আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আপনি কারো চেয়ে কম কিসে।'

গায়ের জামাটা খুলে রেখে আদিত্যবাবু আস্তে আস্তে জলে নামলেন। ঘাটের কাছে আংটি পাওয়া গেল না।

সেবা বলল, 'ভিতরের দিকে নামুন, দুএকটি ডুব দিয়ে দেখুন না।'

আদিত্যবাবু ডুব দিলেন। মজা পুকুর তো নয় প্রেমসমুদ্র। সেবা এক ফাঁকে পালিয়ে এল বাড়িতে।

দিন দুই বাদে শোনা গেল আদিত্যবাবুর জ্বর, তৃতীয় দিনে শোনা গেল ডবল নিউমোনিয়া। আদিত্যবাবু তাঁর চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন। সেবাকে একবারটি দেখতে চান, সেবার বাবা রেগে বললেন, 'কি আস্পর্ধা।'

সেবা বলল, 'বাবুকে গিয়ে বলো, তিনি সেরে উঠলেই দেখা করতে যাব।'

তারপর দিন দশেক বাদে আদিত্যবাবু মারা গেলেন। পরদিন তাঁর চাকর ভজন সিং এসে সেবাকে একটা লেফাফা দিয়ে গেল। তার মধ্যে এক

লাইনের একটি চিঠি ছিল। 'আমাকে ক্ষমা করো।' আর ছিল ওই ফটো। যৌবনে তোলা, বার্ধক্যে রিপ্রিন্ট করা। চিঠিটা সঙ্গে সঙ্গে সেবা ছিঁড়ে ফেলল। কিন্তু ফটোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছিঁড়ল না।

কাহিনী শেষ করে সেবা চুপ কবল।

খানিক বাদে শুভেন্দু বলল, 'কেন ছিঁড়লে না, মরা মানুষের হাতের চিহ্ন বলে নাকি ফটোটা খুব সুন্দর বলে?'

সেবা বলল, 'না তাও নয়, ভাবলাম সবাই তো আমরা একদিন বুড়ো হব।'

এপার ওপার

দাম্পত্য কলহ যখন শুরু হয় তার ক্রিয়াটা যে নিশ্চিত লঘু হবে শাস্ত্রের এমন আশ্বাসে স্বামী স্ত্রী কারোরই তখন বিশ্বাস থাকে না। বরং প্রবচনের ঠিক উল্টোটাই হতে দেখা যায়। শুরুতে লঘু, উপসংহারে গুরু। সংসারের হাজার বিষয়ের মধ্যে কখন কোনটিকে উপলক্ষ্য করে যে ঝগড়া লেগে যাবে তা আগে থেকে বলবার জো নেই। ধোপার হিসাব, ইলেকট্রিকের বিল, সুরমার বাপের বাড়ি কি কোন বান্ধবী পরিবারের বিয়ে অন্নপ্রাশনে লৌকিকতা—পৃথিবীতে এমন বিষয় নেই যা নিয়ে মনান্তর মতান্তর না ঘটতে পাবে। আর এই সব বৈষয়িক কারণ নিয়ে শুরু হওয়া ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত প্রায়ই অবৈষয়িক আধ্যাত্মিক রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। সুরমা বলে এই দশ বছরের বিবাহিত জীবনে সে একটি দিনের জন্যেও সুখশান্তির মুখ দেখেনি, আমার হাতের চাপে, আমার জবরদস্তির দৌরাত্ম্যে নিজের সখ আহ্লাদ হৃদয়মন বলে কোন বস্তু তার আর নেই। আমি চাই তাকে একটি কলের পুতুল বানিয়ে রাখতে। তা সংসারে যদি ভালবাসা থাকে তাহলে পুতুল হয়েও থাকা যায়। কিন্তু আমার মনে স্ত্রী সম্বন্ধে এক ছিটেও দরদ নেই। এখন পর্যন্ত অন্য মেয়েরা আমার মনকে আকর্ষণ করে কথাবার্তায় কবিত্ব আর উৎসাহ লাগায় কিন্তু সুরমার বেলায় আমি একটি নীরস নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি। তখন আমার মুখে জমা-খরচের কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই। দৈন্য-দুর্দশার ফিরিস্তি শুনতে শুনতে সুরমার কান পচে গেছে। আর সে সব শুনতে চায় না।

আমি জবাব দিই সুরমার মত এমন আত্মসুখসর্বস্ব মেয়ে পৃথিবীতে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রাণপাত করে আমি যা রোজগার করি তা সুরমা আর তার ছেলেমেয়েদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্তেই। কিন্তু সে সম্বন্ধে সুরমার মনে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। আর প্রেম

ভালোবাসা এসব কথা যেন সে আর উচ্চারণ না করে। তার মত দুর্ভাষিণী মুখরা মেয়ের ভাষা শুনলে পুরুষের মনের ভালোবাসা বাপ বাপ করে রাজ্য ছেড়ে পালায়। আমি পরম সহিষ্ণু বলেই তার এই বাড়াবাড়ি মুখ বুজে সহ্য করি। আমি তাকে কলের পুতুল বানিয়ে রাখতে চাই একথা মিথ্যা। সুরমাই বরং আমাকে টাকা রোজগারের কল ছাড়া আর কিছু মনে করে না। শুধু টাকা এনে দেওয়া ছাড়া সংসারে আমার আব কিছুই করবার নেই, বলবার নেই। বলতে গেলেই সে তেলে বেগুনে জলে ওঠে। এই যখন তার মনের ভাব তখন সে নাটক উপন্যাসের ঢঙে ভালোবাসাব জন্যে আপসোস যেন আর না কবে। বস্তুটা দিলেই তবে পাওয়া যায় শুধু নিতে চাইলেই হয় না।

শনিবার সন্ধ্যা থেকে ঝগডাটা শুরু হয়েছে। রবিবার সকাল দুপুর গেছে —বিকালও কাটে কাটে। সুরমার হাতে কাজ মুখে ঝগডা। আমারও হাতে কাগজ মুখে কলহ। সারাদিনের মধ্যে দৈনিক কাগজখানিতে ভালো করে চোখ বুলাবার পর্যন্ত সময় হয়নি।

ঝগড়া থামাবার জন্যে মা বার কয়েক চেষ্টা করে শেষে নাতি-নাতনীদের দিকে মন দিয়েছেন। শানু মিনুরা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে আড়ালে আডালে ঘুরে বেডাচ্ছে। কারো মুখ থেকে একটা টু শব্দও বেরোচ্ছে না। ওরা জানে নাওয়া খাওয়া নিয়ে আজ যদি কেউ কোন মতলব করে মা ওদের আস্ত রাখবে না।

সারা বাড়ি চুপচাপ। শুধু আমার আর সুরমার মধ্যে গলার স্বরের প্রতিযোগিতা চলছে।

বাড়িতে আরও তিন ঘর ভাড়াটে আছে। মাঝে মাঝে তাদের মৃদু মন্তব্য ধারালো পরিহাস কানে আসছে। কিন্তু আমরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ ওসব ঘরেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন ঝগড়া লাগে দর্শক আর শ্রোতা হিসাবে আমরাও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি বাড়িটা

বস্তিবাড়ি হয়ে উঠল, দুমিনিট যে একটু শান্তিতে নিরিবিলিতে কাটাব তার যো নেই।

যে খণ্ড-প্রলয় শুরু হয়েছিল তা শেষ করবার জন্যে কি আমার কি সুরমার কারোরই কোন গরজ ছিল না। কিন্তু বাইরে থেকে দরজার কড়া নড়ে ওঠায় হঠাৎ রসভঙ্গ হোল। নিতান্ত অপ্রসন্ন হয়ে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের জন্যে দোর খুলে দিয়ে দেখি পুরনো বন্ধু শৈলেন সুর।

বলতেই হোল, 'এসো ভিতরে এসো।'

সুরমা যে আঁচল কোমরে জড়াতে যাচ্ছিল, তার খানিকটা মাথায় তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি হেসে বলল, 'আসুন'।

শৈলেন স্মিতমুখে ঘরে ঢুকল। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝা যায় না। আট দশ বছর আগে যেমন ছিল এখনো শৈলেন প্রায় তেমনি আছে। গায়ের ফর্সা রঙের সঙ্গে কালো স্যুট বেশ মানিয়েছে। ওর প্রসন্ন হাসি মুখ দেখে মনে হিংসা হোল।

চেয়ারটা দেখিয়ে বললাম, 'বোসো'।

শৈলেন আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'আপনি কি বলেন, বসব? না বাইরে গিয়ে আড়ি পেতে দাঁড়াব?'

সুরমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনার যা ইচ্ছে'।

বললাম, 'আড়ি পাতবার আর দরকার হয় না। তোমার বন্ধুপত্নীর যা গলা তা বোধ হয় রাস্তার মোড় থেকেও শুনতে পাবে।'

সুরমা প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কথা শুনুন শৈলেনবাবু, গলা শুধু আমারই আছে, আর যেন কারো নেই।'

শৈলেন সঙ্গে সঙ্গে সুরমার পক্ষ নিয়ে বলল, 'সত্যি বউদি, আমি যতীনের কথার এক বিন্দুও বিশ্বাস করিনে। বাস ষ্টপেজ থেকে বরং ওর সিংহ গর্জনই শোনা যাচ্ছিল, আপনার একটি কথাও আমার কানে যায়নি। আমি অবশ্য তার জন্যই উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম।'

সুরমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনার সব ব্যাপারেই ঠাট্টা। বসুন চা করি।'

শৈলেন বলল, 'তা একটু [illegible] ওতে আপত্তি নেই।'

পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে শৈলেন আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

উনুন ধরাতে দেরি বলে সুরমা ইলেকট্রিক ষ্টোভেই চা করতে বসে গেল। শৈলেন একটুকাল সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তারপর খবর কি বলুন বউদি।'

সুরমা বলল, 'আমাদের খবরতো রাস্তা থেকে শুনতে শুনতেই এলেন, আপনাদের খবর এবার বলুন। কেমন আছে বাণুদি। ছেলেমেয়েরা সব ভালো আছে তো?

শৈলেন বলল, 'সপ্তাহখানেক হোল তারা সব বহরমপুরে মামাবাড়িতে গেছে। ভালোই আছে আশা করি। কেবল আমিই ভালো নেই।'

সুরমা মুখ ফেরাল। 'মাত্র এই কদিনের বিরহেই—', মুখ নামিয়ে হাসি গোপন করল সুরমা।

কে বলবে এই দুদিন ধরে তার শুধু ঝগড়া করে দিন কেটেছে।

শৈলেন বলল, 'হ্যাঁ বিরহ বইকি। ভারি অসুবিধে। বাড়িতে প্রতিবেশী ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া, অফিসে কলীগদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে আছে। দাম্পত্য কলহ যে মানুষকে বাইরের কত কাটা-কাটি মারামারি থেকে বাঁচায় তার আর ঠিক নেই। আমরা যত শান্ত যত সভ্যই হই ঝগড়া করার প্রবৃত্তিটা আমাদের মনের মধ্যে থাকেই। স্ত্রীর ওপর দিয়ে যদি সে সাধ না মেটাই বাইরের পড়শীরা তার ফলভোগ করে। তাই সভ্যসমাজের পক্ষে দাম্পত্য-কলহ যেমন প্রয়োজন তেমনি স্বাস্থ্যকর।'

সুরমা চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'ও লেকচার আর এ বাড়িতে দেবেন না, দোহাই আপনার।'

চা শেষ করে শৈলেন হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল, 'চলহে যতীন আজ একটু সিনেমায় যাওয়া যাক। বউদি গত সপ্তাহে কি ছবি দেখেছেন বলুন।'

সুরমা আক্ষেপের সুরে বলল, 'ওকথা আর বলবেন না শৈলবাবু। এ বাড়িতে ওসব পাট নেই। গত ছমাসের মধ্যেও—'

কথাটা শেষ করবার দরকার হোল না সুরমার।

শৈলেন আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, 'ভারি অন্যায়, এ তোমার ভারি অন্যায় যতীন। সাধে কি আর বউদির সঙ্গে তোমার এত ঝগড়া লাগে ? সপ্তাহে একবার করে যদি সিনেমায় যাও আর মাসে একবার করে থিয়েটারে তাহলে দেখবে দিব্যি সুখে-শান্তিতে যৌথ জীবন ধারা বয়ে চলেছে। কলহ কেলেঙ্কারির কোথাও কোন চিহ্ন নেই।'

শৈলেনের কথার ভঙ্গিতে হেসে বললাম, 'অফিসের চাকরির ফাঁকে ফাঁকে তুমিতো এতদিন ইনসিওরেন্সের দালালিই করতে। সিনেমা, থিয়েটারের দালালি কবে থেকে ধরেছ বলতো।'

সুরমা বলল, 'আপনারা তুই বন্ধুতে যান, আমার কাজকর্ম আছে। রাণুদি ফিরে আসুক আমি বরং তাকে নিয়ে একদিন দেখব।'

কিন্তু শৈলেন নাছোড়বান্দা। সে টেবিল চাপড়ে বলল, 'তা হয় না। আপনি যদি না যান আমি যতীনের সামনেই আপনাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে বাসে তুলব।'

বলে শৈলেন তার দিকে এগিয়ে যেতেই সুরমা চপলা কিশোরীর মত তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে সবে গেল।

বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিতে তার বেশি সময় লাগল না। মাকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘর সংসার বুঝিয়ে ছেলেমেয়েকে চানাচুর, চীনাবাদাম কেনার পয়সা ঘুষ দিয়ে রঙিন শাড়ি পরে চুল বেঁধে আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে এসে শৈলেনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'চলুন, আপনি যখন কিছুতে ছাড়বেনই না।'

শৈলেনকে বললাম, 'কি ছবি দেখবে বল। ভালো ছবিটবি কি কিছু হচ্ছে ?'

শৈলেন বলল, 'সব ছবিই ভালো ছবি। ভালো হোক কি নাহোক তাতে

কার কি এসে যায়। সমালোচনার ভার ক্রিটিকের ওপর দিয়ে সাদা মন নিয়ে চল, দেখবে খুব আনন্দ পাবে। যে কোন সিনেমা হাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হবে পৃথিবীতে রোগ শোক জরা মৃত্যু বলে কিছু নেই। দেখবে কত হাল ফ্যাসানের রঙ-বেরঙয়ের শাড়ি, চুল বাঁধবার কত রকমের ধরণ, চুড়ি আর হারের নতুন নতুন প্যাটার্ণ, হাসিখুশিভরা অচেনা অথচ চিনি চিনি মনে হওয়া সব মুখ—তোমাব টিকিটের দাম পুষিয়ে যাবে। সিনেমায় যারা শুধু পর্দার ছবি আব কলের গান শুনতে যায় তুমি নিশ্চয়ই সেই বোকাদের দলে নও।'

সুরমা একটু পিছিয়ে পড়েছিল, দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, 'কি নিয়ে আলাপ হচ্ছিল শুনি।'

শৈলেন বলল, 'একেবাবে বাজে আলাপ। আপনাব শোনবার যোগ্য নয়। চলুন এই বাসটাই ধবা যাক।'

একটা চলমান বাসকে হাত তুলে থামাল শৈলেন। আমবা ওঠবার পর নিজে এসে হ্যাণ্ডেল ধরল।

মিনিট সাতেক বাদে শ্যামবাজার সিনেমা পাড়ায় এসে যখন নামলাম সন্ধ্যার শো আবস্ত হতে বেশি আর দেরি নেই।

শৈলেন বলল, 'কোন বই দেখবেন। কোন হাউসে যাবেন।'

সুরমার হয়ে আমি জবাব দিলাম, 'আমাদের পক্ষে সবই সমান। যেখানে হয় চল।'

আর সময় নষ্ট না করে শৈলেন কাউণ্টারেব কাছে গিয়ে তিন খানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট কেটে বলল, 'চল।'

টাকাটা আমি দিতে যাচ্ছিলাম, শৈলেন ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ, থাম তো হয়েছে, আর ভদ্রতার দরকার নেই।'

কিন্তু সবাই মিলে ভিতরে ঢুকবার আগে আরো দুএক মিনিট দেরি হয়ে গেল। ইন্‌সিওরেন্সের দালালি কবে বলে শৈলেনের পরিচিত আর বন্ধু-বান্ধবের গণ্ডি আমার চেয়ে অনেক বড়। দেখি টিকিট কেটে সে আর একজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ,

শ্যামবর্ণ, সাধারণ দর্শন পুরুষ। আমাদের কাছে ডেকে শৈলেন বলল, 'এসো আলাপ করিয়ে দিই। অজয় চক্রবর্তী আমার বন্ধু, ইউনিভার্সিটির লেকচারার। আর ইনি যতীন সেন, পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে আছেন, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর ইনি মিসেস সেন।'

আমরা নমস্কার বিনিময় করলাম, কিন্তু বাক্য বিনিময় করবার কোন সুযোগ পেলাম না। লক্ষ্য করলাম আলাপ করবার উৎসাহ অজয়বাবুর তেমন নেই। তিনি বারবার উৎসুক দৃষ্টিতে দোরের দিকে তাকাচ্ছেন আর নিরাশ হয়ে চোখ ফিরিয়ে আনছেন।

তাঁর ভাব দেখে শৈলেন বলল, 'কিহে, আর কারো আসবার কথা আছে নাকি?'

অজয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমার আর একজন বন্ধুর আসবার কথা।'

শৈলেন বলল, 'তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে অপেক্ষা করি। যতীন, তুমি বরং ওঁকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে বসো। এই নাও, তোমাদের টিকিট।'

কিন্তু অজয়বাবু তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না শৈলেন, তুমি ওঁদের সঙ্গেই যাও, তোমাকে আর এখানে দাঁড়াতে হবে না।'

শৈলেন তাঁর অলক্ষ্যে মুখ টিপে একটু হাসল, বলল, 'আচ্ছা।'

আমরা ভিতরে গিয়ে বসলাম। দেখলাম এত তাড়াতাড়ি করার দরকার ছিল না। প্রথমে নিউজ রীল, তারপর অন্য খান দুই বইয়ের ট্রেলার। আসল ছবি আরম্ভ হতে এখনো দেরি আছে।

খানিকবাদে শৈলেন বলল, 'যাক্‌, এতক্ষণে অজয়ের বন্ধু এসেছেন, আমি ভাবছিলাম বেচারা অজয়ের বুঝি আজ আর সিনেমা দেখাই হোলনা, টিকিটের টাকাটা জলেই গেল।'

আমরা ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকালাম। দেখলাম অজয়-বাবুর পিছনে পিছনে একজন মহিলা এসে ঢুকলেন। টর্চ্চ হাতে করে হাউসের ছেলেটি তাঁদের সীট দেখিয়ে দিল। আমাদের বেশ কয়েক সারি পিছনে, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাসের গা ঘেঁসে তাঁরা গিয়ে বসলেন।

আমি শৈলেনকে বললাম, 'তবে যে বলছিল বন্ধু ?'

শৈলেন বলল, 'আঃ, তুমি দেখছি কথাব আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝ না। বান্ধবীও বন্ধু, কি বলুন বউদি।'

সুরমা কোন জবাব না দিয়ে মুখ টিপে একটু হাসল, তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ছবি দেখতে লাগল।

ইণ্টারভ্যালের সময শৈলেন উঠে দাঁড়িযে বলল, 'যাই, অজয়দের একটু খোজ নিয়ে আসি। যাবে নাকি হে ?'

আমি বললাম, 'না না, ছিঃ, ওদের ডিষ্টার্ব করে লাভ কি ?'

কিন্তু শৈলেন আমাব নিষেধ না শুনে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে গেল, আমি একবাব ঘাড ফিবিয়ে দেখলাম সে অজয়বাবুকে সিগাবেট অফার করে তাঁর বান্ধবীব সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। একটু পরে সিগারেট খাওয়ার জন্য তাবা বাইরে চলে গেল আব ভদ্রমহিলা চুপচাপ বসে বিজ্ঞাপনের কাটিংগুলি দেখতে লাগলেন।

অন্ধকাব ঘবে ছবি ফেব শুরু হওযাব পব শৈলেন এসে আমাদের পাশে বসল।

শো ভাঙলে অজযবাবুদেব সঙ্গে ফের আর একবার দেখা হোল। বলতে গেলে শৈলেনই দেখা করিয়ে দিল।

অজয়বাবু একটু ইতস্তত করে তাঁব সঙ্গিনীর পরিচয় দিয়ে বললেন, 'মিসেস মজুমদার, আমাব বান্ধবী।' বলে অজয়বাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। মেয়েটি একটু সংকোচেব সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর সিঁথি কুমারীর সিঁথিব মত সাদা, পরণে সাদা খোলের একখানা শান্তিপুরী শাড়ি। গায়ে ধূসর বঙের একটি ব্লাউস। মহিলাটি সুন্দরী। গায়ের রঙ গৌর, টানা টানা নাক চোখ, চাপা পাতলা রঙাভ ঠোট। কিন্তু এবই মধ্যে মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। মুখের জায়গায় জায়গায় সূক্ষ্ম রেখার কুঞ্চন। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের কম হবে না। একটু বেশিও হতে পারে। তাঁর তুলনায় অজয়বাবুকে বেশ তরুণ মনে হয়।

সিনেমা হাউস থেকে বেরিয়ে আমরা রাস্তায় নামলাম। শৈলেন হঠাৎ অজয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলনা একটু চা খেয়ে যাওয়া যাক।'

মহিলাটি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'না না শৈলেনবাবু আজ থাক, আজ বড় দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া সন্তুর শরীরটা বড় খারাপ।'

সন্তুর শরীর সম্বন্ধে শৈলেন কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল অজয়বাবু বললেন, 'আমরা এই বাসটা ধরি। এটায় একটু ভিড় কম আছে।'

তাড়াতাড়ি ওরা দক্ষিণগামী সেই বাসটায় উঠে পড়লেন।

সুরমা বলল, 'আর দেরি করে লাভ কি? আমরাও একটা বাস নিই। রাত হয়ে গেছে।'

শৈলেন মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, অত তাড়াতাড়ি পালালে চলবে না। সিনেমা কেমন দেখলেন বলুন। আর যতীন তুমি তো আচ্ছা কৃপণ হয়েছ হে। এক কাপ চা-ও কি তোমার হাত দিয়ে আজ গলবে না।'

শৈলেনের পীড়াপীড়িতে আমরা সিনেমা-হাউসের পাশের রেষ্টুরেণ্টটায় গিয়ে ঢুকলাম। বয় রঙিন পর্দা তুলে একটা কেবিন আমাদের দেখিয়ে দিল।

সুরমা এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু নিল না। আমারও কিছু খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শৈলেন খুব ভোজন রসিক। আমি ওর জন্যে দুটি কাটলেটের অর্ডার দিলাম।

কাঁটা-চামচ চালাতে চালাতে শৈলেন হঠাৎ বলল, 'আশ্চর্য, এই আট বছর ধরে ওরা ঠিক একই রকম ভাবে চলল। একটুও অদল-বদল হোল না।'

বললাম, 'কার কথা বলছ?'

শৈলেন বলল, 'ওই অজয়দের কথা।'

সুরমা এবার বলে উঠল, 'সত্যি, ওঁদের সবই কেমন যেন একটু অদ্ভুত অদ্ভুত, তাই না?'

শৈলেন মৃদু হেসে বলল, 'আপনারও চোখে পড়েছে তাহলে। অদ্ভুত বই কি। আমাদের কাছে ওদের জীবনের ওই প্যাটার্ণটা ভারি খাপছাড়া লাগে। বলতে কি আমার তো মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়।'

হেসে বললাম, 'কি ব্যাপার। তোমার ধৈর্যের সীমা ভাঙল কিসে।'

সুরমারও কৌতূহল কম নয়। তার আগ্রহ লক্ষ্য করেই শৈলেন সম্পূর্ণ কাহিনীটা আমাদের শোনাল।

মিসেস মজুমদার শৈলেনের গায়ক-বন্ধু সুরদাস মজুমদারের স্ত্রী। কলেজে পড়বার সময় শৈলেন আর অজয় দুজনই সুরদাসবাবুদের পটলডাঙ্গার বাসায় যেত। সুরদাস তাদের সুরের ক্ষুধা মেটাতেন আর তাঁর স্ত্রী প্রণতি তাদের চা খাইয়ে আপ্যায়িত করতেন। অবশ্য এই পানীয়ের সঙ্গে নিত্য-নতুন ভোজ্যের ব্যবস্থাও থাকত। রান্নায় চমৎকার হাত ছিল প্রণতির। আর ঘরকন্নায় দারুণ উৎসাহ। সুরদাসের বন্ধুদের আদর-আপ্যায়ন করা, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার ভারও ছিল প্রণতির ওপর। কারণ সুরদাস যখন রেওয়াজ করতেন তখন তিনি সাধারণ ভদ্র-অবস্থায় থাকতেন না। সুরের সাধনারত অবস্থায় তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি হোত অসুরের মত। তাছাড়া তাঁকে বাড়িতে প্রায়ই পাওয়া যেতনা। কখনো গানের জলসায় কখনো বড় ওস্তাদের কাছে কখনো অনুরাগিনী কোন ছাত্রীর সান্নিধ্যে তাঁর সময় কাটত। প্রণতি বাচ্চা ছেলেকে মানুষ করতেন, ঘর-সংসার গুছাতেন, স্বামীর তানপুরার ঢাকনিতে ফুল তুলে দিতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই শৈলেন আর অজয়ের চোখে পড়ল প্রণতি সুরশিল্পী না হলেও তাঁর স্বাভাবিক গলার স্বর মিষ্টি, তাঁর চলার ভঙ্গিতে ছন্দ, তাঁর জীবন-যাত্রার মধ্যে তান লয় সমন্বিত এক অপূর্ব সঙ্গীত আছে। কিন্তু সেই সঙ্গীতের দিকে সুরদাসের কান নেই। তিনি বধির। নিজের গান শোনাতেই তিনি ব্যস্ত। অন্যের গানের দিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

আরো কিছুদিন বাদে শৈলেনরা অনুভব করতে পারল যে প্রণতির জীবনে যে অশ্রুত সঙ্গীত আছে তার সুর বড় করুণ, অনেকটা চাপা-কান্নার মত। কারণ সুরদাসের জীবন যাপনের ধরণের সঙ্গে প্রণতির রুচির কোন মিল নেই। সুরদাস শুধু অগোছালো নয় অপরিচ্ছন্ন। তাঁর তৃষ্ণা শুধু চায়ে মেটেনা, ঝাঁঝালো, উগ্র পানীয় খোঁজে। তাঁর সুরশ্রী নিজের স্ত্রীর মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয় নানা জাতের নানা আকার-প্রকারের অনুরাগিনীদের মধ্যে রাগিনীর বিভিন্ন মূর্তিকে তিনি দেখতে পান, দেখতে চান। কিন্তু বাইরের লোকের চোখে এ সব বড দৃষ্টিকটু লাগে। তুএকটি ভদ্র-পরিবারে তাঁর যাতায়াত নিষিদ্ধ হয়। তারপর এমন সব পাড়ায় এমন সব মেয়েদেব সঙ্গে তাঁর মেলামেশা শুরু হোল যাদের মধ্যে সুবেব সু-টুকুও নেই। অথচ সেই সব সংসর্গেই সুরদাসেব প্রতিভা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

কাহিনীব এই অংশটুকু পযন্ত শৈলেনেব প্রত্যক্ষ। তাবপবের ঘটনাগুলি সব অলক্ষ্যে পবোক্ষে ঘটতে থাকে। বাপ মারা যাওয়াব পব শৈলেন সংসার আর চাকবি-বাকরি নিযে ব্যস্ত হযে পডে। আব তাব বন্ধু অজয়বাবু পড়া শেষ কবে কলেজে পডানো শুরু কবেন। মিতভাযী, মিতাচাবী, সুজন-সজ্জন হিসাবে বন্ধুমহলে তাঁব নাম ছডাতে থাকে, অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রমহলেও বেশ সুখ্যাতি হয়।

অথচ এই অজয়বাবুকে নিয়েই সুরদাসবাবুব সংসারে একদিন গোলমাল লেগে যায়। অজয় আব প্রণতিব রুচিব মিল, মনের মিল তাঁব ভালো লাগে না। ওঁদের মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা তিনি সহ্য কবতে পাবেন না। ক্রমে তাঁর ভাষা আচাব-আচরণ আপত্তিকর হযে ওঠে। তিনি অপমান করে অজয়কে একদিন বাডি থেকে বাব করে দেন, স্ত্রীকেও নানাভাবে নির্যাতন করেন।

অজয়ের পরামর্শে প্রণতি একটা স্কুলে মাষ্টারি নেন আর ছেলেকে নিয়ে গড়পারে মাসতুতো ভাইয়ের সংসাবে চলে আসেন। সুবদাস অনেক সাধ্যসাধনা করেও স্ত্রীকে আব ফিরিযে নিতে পাবে না। শেষ পর্যন্ত বন্ধুমহলে অজয় আর প্রণতির নামে তুর্নাম বটিয়ে বেডান। আবো কিছুদিন বাদে একটি তরুণীকে বিযে করেন।

হিন্দু-সমাজে পুরুষের পক্ষে বহু-বিবাহের সুযোগ আছে কিন্তু মেয়েদের দিক থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন সুবিধে নেই। প্রণতি স্বামীর আচরণের প্রতিবাদ হিসেবে সিঁথিব সিঁদুব তুলে ফেলেন, কিন্তু আব বেশি দূর এগোতে

পারেন না। নামের সঙ্গে সুরদাসের পদবীটাও আলপিন দিয়ে গাঁথা থেকে যায়।

বাবা-মা দাদা-বউদি ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে অজয়বাবুর বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার। তিনি সকলেরই স্নেহের পাত্র। বিয়ের জন্যে আদেশ-উপদেশ অনুরোধ-উপরোধের অন্ত থাকে না। কিন্তু অজয়বাবু নির্বিকার। তারপর বাপের শাসন মার কান্না শুরু হয় কিন্তু অজয়বাবু অবিচল।

বন্ধুমহলে মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। অজয় আর প্রণতির যুগল-রূপ কখনো আর্ট একজিবিশনে, কখনো গানের জলসায়, কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পুরনো ইডেন-উদ্যানে কারো না কারো চোখে পড়ে। আজকের মত শৈলেনের এমন অনেকদিন ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

বন্ধুদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ আলোচনা-সমালোচনা যে ওদের কানেও না যায় তা নয়। কিন্তু কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সরাসরি কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে ওঁরা জবাবটা এড়িয়ে যান, বন্ধুদের সামনে নিজেদের পুরোপুরি সত্য-পরিচয় দেওয়ার সাহস ওঁদের নেই।

শৈলেন কাহিনীর উপসংহার করে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ওরা এমনি করে ন বছর কাটিয়ে দিল। বোধহয় বাকি জীবনটাও ওরা এমনি করে কাটাবে।'

বললাম, 'তুমি কিছু বল না?'

শৈলেন বলল, 'বলি আবার না? ভীরু কাপুরুষ বলে গাল দিই, সুবিধেবাদী বলে পরিহাস করি। কিন্তু ওরা তা গ্রাহ্য করে বলে তো মনে হয় না।'

সুরমা এতক্ষণ বাদে বলল, 'ওঁরা বিয়ে করলেই তো পারেন।'

শৈলেন বলল, 'আমিও তো তাই চাই। শুধু আমি নই, আমার মত সব গৃহস্থ বন্ধুই ওদের বিবাহিত দম্পতি হিসাবে দেখতে চায়। যৌথজীবনের যে প্যাটার্নটা আমরা বেছে নিয়েছি দোষত্রুটি সত্ত্বেও তার চেয়ে ভালো প্যাটার্ন কি আর আছে বলো? অবশ্য ওদের বিয়েতে আইনের দিক থেকে কিছু

অসুবিধে আছে। কিন্তু আমি বলি, দরকার কি তোমাদের আইনের, দরকার কি তোমাদের সমাজের। আমাদের বন্ধু-সমাজই তো যথেষ্ট। তোমরা ঘর বাঁধ সেই ঘরে আমরা আসব, তোমাদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে-থা দেব আর কি চাই তোমাদের?'

বললাম, 'অজয়বাবু কি বলেন?'

শৈলেন বলল, 'কি আর বলবে! সে প্রণতির দোহাই দেয়। প্রণতি নাকি সন্তুর ভবিষ্যতের কথা ভাবে, ফের বিয়ে করলে সমাজে তার মান-সম্মান নষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কা আছে। বাজে কথা। সন্তু যেন কিছু বোঝে না। এগার-বার বছরের ছেলে, তার কি টের পেতে কিছু বাকি আছে নাকি!'

বললাম, 'আর প্রণতি দেবী কি বলেন? তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখেছ?'

শৈলেন বলল, 'দেখেছি বই কি। প্রণতি অজয়ের দোহাই দেয়। অজয় নাকি তার বুড়ো বাপ-মার মনে কষ্ট দিতে চায় না। ছোট ভাই-বোনদের ছেড়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করা নাকি তার ইচ্ছা নয়। অথচ ওদের ওই একান্নবর্তী রক্ষণশীল পরিবারে আগের পক্ষের ছেলেকে নিয়ে প্রণতি বাস করতেও পারে না। কিন্তু এও বাজে কথা।'

বললাম, 'তবে আসল কথাটা কি।'

শৈলেন বলল, 'আসল কথা ওরা নিজেরাই ভীরু, ওরা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত। বোধ হয় ওরা একজন আর একজনকে ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, ভালোবাসে না।' বলে শৈলেন পরম বিরক্তির সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। রেষ্টুরেন্টের বিল চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তারপর দুএক কথার পর শৈলেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উত্তরগামী একটা বাসে উঠে পড়লাম।

সুরমা আমার পাশে চুপচাপ বসে রইল। একটু বাদে আমি বললাম, 'সিনেমার গল্পটার কথা ভাবছ বুঝি? আধা ডিটেকটিভ কাহিনীটা কেমন লাগল তোমার। নতুন মেয়েটির অভিনয় কিন্তু মন্দ হয়নি। কি বল?'

সুরমা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি সিনেমার কথা ভাবছিনে।'

বললাম, 'তবে ?'

সুরমা বলল, 'ওঁদের কথাই ভাবছি। দেখ একদিক থেকে ওঁরা কিন্তু বেশ আছেন।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কি রকম ?'

সুরমা ছোট একটি নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'ওঁদের মধ্যে আমাদের মত ঝগড়া-বিবাদ নেই।'
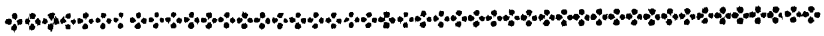
সন্ধান

ছত্রিশ বৎসর বয়সে চিত্রশিল্পী অজয় সরকারের ভারি সাধ হল তার মায়ের একখানা প্রতিকৃতি আঁকবে। ভবানীপুরের শিল্পীবন্ধু সুবিমল চাটুয্যের বাড়িতে তার মায়ের পোর্ট্রেটখানা দেখে এসেই অবশ্য এই প্রেরণাটা পেয়েছে অজয়। দামী ফ্রেমে বাঁধানো বড় একখানা অয়েল পেইন্টিং নিচের বসবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে সুবিমল। স্বচ্ছন্দ পরিবারের রূপবতী ভদ্রমহিলা। তাঁরই মাঝবয়সের একটি প্রতিকৃতি। প্রসন্ন পরিপূর্ণতায় একেবারে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি। যে দেখছে সেই সুখ্যাতি করছে। সুবিমলের নিজের মায়ের এই পোর্ট্রেট তার সব সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে। পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দর উঠেছে এই ছবির। কিন্তু সুবিমল এ ছবি কিছুতেই বিক্রি করবে না। বিভিন্ন একজিবিশনে নিশ্চয়ই পাঠাবে। কিন্তু দর্শকেরা এ ছবি শুধু চোখ দিয়ে দেখবে, টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না।

সুবিমলের বাবা মা দুজনেই বেঁচে। তার মায়ের বয়স এখন পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নর কম হবে না। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন মাত্র চল্লিশ পেরিয়েছেন। সত্যি এই বয়সে এত লাবণ্য সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। বড ঘরের মেয়ে বড ঘরের বউ। শুধু রূপ লাবণ্য নয়, শিক্ষা, রুচি, সৌজন্য শিষ্টাচারেরও তিনি অধিকারিণী। তা ছাড়া অগাধ বাৎসল্য তাঁর মনে। ছেলের বন্ধুদের তিনি নিজের ছেলের মতো দেখেন, আদর যত্ন করেন। সুবিমলের এই পোর্ট্রেট আঁকা উপলক্ষ্য করে তিনি একদিন ছেলের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। বেশির ভাগ তরকারিই তিনি নিজে রেঁধেছেন। নিজেই পরিবেশন করলেন। পরনে চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। মোজেইক করা ঘরের মেঝেয় সারি সারি ফুলকাটা আসন পড়ল। আমিষ নিরামিষে পঞ্চদশ ব্যঞ্জন পরিবেশন করতে করতে ছেলের বন্ধুদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'রান্না কেমন হয়েছে, বাবা।'

সুবিমলের অন্যতম বন্ধু হীরক সেন জবাব দিল, 'চমৎকার। এমন মায়ের ছেলে হলে আমরাও যশস্বী হতাম মাসীমা।'

মাসীমা মৃদু হেসে বললেন, 'পাগল ছেলের কথা শোনো। সব মাই মা, সব মাই সমান।'

ভোজের আসর থেকে বাসে করে ফিরে আসতে আসতে অজয় সরকার সংকল্প করল সেও নিজের মার একখানা ছবি আঁকবে।

বাসায় এসে স্ত্রী বেলাকে নিজের সংকল্পের কথা জানাল অজয়। বেলা একটু হেসে বলল, 'সুবিমলবাবু পেরেছেন বলে তুমি কেন পারবে? মা তো শুনেছি তোমার আড়াই বছর বয়সের সময় মারা গেছেন। তাঁর কথা কি তোমার কিছু মনে আছে?'

অজয় বলল, 'তোমার ধারণা স্মৃতি ছাড়া আর্টিস্টদের কোন সম্বল নেই না? কল্পনা বলে একটা কথা আছে তা শুনেছ? আমার মাকে আমি সেই কল্পনার রঙে ফুটিয়ে তুলব তুমি দেখে নিয়ো।'

বেলা বলল, 'তা যদি পারো তো, ভালো কথা।'

সত্যি কল্পনা ছাড়া আর কিছুর ওপর নির্ভর করবার উপায় নেই। অজয়ের মার একখানা ফোটো পর্যন্ত নেই ঘরে। এই ফোটোর জন্যে কয়েকবারই খোঁজ খবর করা হয়েছে। গাঁয়ের বাড়িতে তাদের একান্নবর্তী পরিবারের একটি গ্রুপ ফোটো আছে তাতে বাবা, কাকা, জেঠীমা প্রায় সবাই রয়েছেন। নেই শুধু অজয়ের মা। এর কারণ অজয় একবার জানতে চেয়েছিল। পিসীমা বলেছিলেন, 'ফোটো যখন তোলা হয় তখন মেজো বউ এখানে ছিল না, বাপের বাড়ি গিয়েছিল।' জেঠীমা এর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আপনার তাহলে ভালো করে মনে নেই, ঠাকুরঝি। নির্মলা তখন এখানেই ছিল। ঠাকুরপো তার চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করাতে সেই যে ঘরের কোণে গিয়ে লুকোল, এত সাধাসাধি এত টানাটানি কিছুতেই তাকে আর ক্যামেরার সামনে এনে বসাতে পারলাম না। ফোটোগ্রাফার তারক দত্ত বলল আর একদিন এসে মেজো বউয়ের ফোটো তুলবে। সে সুযোগ আর আসেনি।'

বিধবা প্রৌঢ়া জেঠীমা এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। সে কথা শুনে বাবার ওপর রাগ হয়েছিল অজয়ের। বাবা কেন মার চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করতে গেলেন। তা না করলে তো মার একখানা ফোটো অজয়ের হাতে এসে পৌছত।

অথচ জেঠীমা, পিসীমা, কাকীমাদের কাছে অজয় যতটা শুনেছে মা অসুন্দরী ছিলেন না। গায়ের রঙ অবশ্য একটু কালো ছিল। কিন্তু টানা টানা নাক বড় বড় চোখ পাতলা ঠোঁটে যে মুখশ্রীটুকু ফুটে উঠত তা নাকি বাড়ির আর কোন বউয়েরই ছিল না। আর ছিল মাথা ভরা কালো একরাশ চুল। তেমন কেশবতী মেঘবতী কন্যা সরকার বাড়িতে বা গাঁয়ের আর কোন বাড়িতে কেউ দেখেনি। ছেলেবেলায় পিসীমাদের কাছে এ গল্প শুনেছে অজয়। অত অল্প বয়সে বাড়ির যে বউ মারা গেছে তার রূপগুণের বর্ণনায় হয়তো একটু অতিশয়োক্তির অলংকার এসে মিশেছিল। তবু মোটামুটি মায়ের চেহারার একটা আন্দাজ তাদের বর্ণনা থেকে পেয়েছিল অজয়। সেই সব বর্ণনার ওপরে নির্ভর করেই সে কাগজ পেনসিল নিয়ে স্কেচ করতে বসল।

কিন্তু খানিকটা চেষ্টা-চরিত্রের পর নিজেই বুঝতে পারল কিছুই হচ্ছে না। মানে যা হচ্ছে তা মনঃপূত হচ্ছে না অজয়ের। অথচ ছেলেবেলায় এই মাকে সে কতবার যে স্বপ্নে দেখেছে তার ঠিক নেই। জেঠীমা, পিসীমারা যেমন বলতেন ঠিক তেমনটি। তিনি এসে অজয়ের শিয়রের কাছে বসেছেন। আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বিশেষ করে জরজারি হলে এই স্বপ্ন আরো বেশি করে দেখত অজয়। জেঠীমা সে কথা শুনে আঁতকে উঠতেন, 'সর্বনাশী মায়ার বাঁধন কাটাতে পারেনি। কাটানো কি সহজ। ঠাকুরপোকে বলতে হবে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসুক। তুই ভয় পেয়েছিলি নাকিরে অজু।'

অজয় বলত, 'না জেঠীমা ভয় কেন পাব।'

জেঠীমা তবু ভরসা পেতেন না। অজয়ের কোমরে একটা কালো তাগার সঙ্গে লোহার চাবি বেঁধে রাখতেন। তাছাড়া হাতে গলায় নানারকম তাবিজ কবচও পরতে হত। তবু এসব রক্ষা কবচের বেড়ি ডিঙিয়েও মা প্রায়ই

জেঠীমা বললেন, 'হায়রে কপাল, যে বেঁচে আছে ছ-মাস ন-মাসেও তার একবার খোঁজ করবাব নাম নেই। যে মরে গেছে তাকে নিয়ে টানাটানি। তোব মা তো কেবল পেট থেকে নামিয়ে দিয়েই খালাস। কোলে পিঠে করে মানুষ কবেছে এই জেঠীই।'

অজয় বলল, 'তোমার ছবিও আঁকব জেঠীমা।'

'আমার ছবি এঁকে তোমাব কাজ নেই বাপু। আমার চোখ ছুটি তুমি সারিয়ে দাও।'

'দেব জেঠীমা, বললাম তো দেব। তুমি একবার আমাব মায়ের কথা বল।'

অনুরোধ উপবোধে জেঠীমা বলতে শুরু কবলেন। অজয় ছেলেবেলায় যে সব কথা যে সব গল্প শুনেছে প্রায সেইগুলিবই পুনবাবৃত্তি কবলেন জেঠীমা। কিন্তু এখনকাব বলায় সেই তখনকার বস আব নেই। তাঁব বলার এই ভঙ্গী শিল্পীর মনে কোন অনুপ্রেরণা যোগায় না। তাব কল্পনেত্রের সামনে কোন মূর্তি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। অজয়েব মাব কথা বলতে গিয়ে ফাঁকে ফাঁকে নিজের কথাই বলতে লাগলেন জেঠীমা। এখানে তাঁর বড় কষ্ট। খাওয়ায় কষ্ট, নাওয়ায় কষ্ট। বেঁচে থাকাই কষ্টকর হযে উঠেছে। বাঁচতে তিনি আব চান না। কিন্তু মানুষের তো ইচ্ছামৃত্যু নেই। সে বর শুধু ভীষ্মই পেয়েছিলেন। শুনতে শুনতে এক সময় উঠে পড়ল অজয। পকেট থেকে একটি টাকা বার করে জেঠীমাব হাতে গুঁজে দিযে বলল, 'দুধ কিনে খেয়ো। মাসের শেষ বেশি কিছু দিতে পারলাম না।'

জেঠীমা বললেন, 'সে যখন পারো দিয়ো। আমাব চোখের কথা যেন মনে থাকে।'

তাঁকে প্রণাম কবে বেলেঘাটার দিকে রওনা হল অজয। খুঁজে খুঁজে বার করল শ্রীধর দাস লেনেব ভুবন ধরেব বাসা।

অজয়ের মায়ের মামা ভুবন ধর একেবারে শয্যা নিয়েছেন। পুত্র পুত্রবধূরা সেবা শুশ্রূষা করে। তাদের সঙ্গে দু-চার কথা বলে অজয় বিরাশি বছরের বৃদ্ধ

ভুবন ধরের সঙ্গে আলাপ শুরু করল। কুশল প্রশ্নাদির পরে বলল, 'আমার মায়ের ছেলেবেলার কথা বলুন দাদু।'

ভুবন ধর বললেন, 'হতভাগা, এতদিন বাদে তার কথা তোর মনে পড়েছে। কেন নিমির কথা শুনে কি করবি তুই।'

অজয় বলল, 'আমি তাঁর একখানা ছবি আঁকব।' নিজের আঁকা স্কেচগুলি ভুবন ধরকে দেখাল অজয়। তাঁর চশমা সুতোয় বাঁধা। সেই সুতো কানে জড়িয়ে চশমাটা নাকের ডগায় রেখে তিনি ভালো করে অজয়েব আঁকা স্কেচগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'উঁহু, হয়নি দাদু।'

অজয় বলল, 'একখানাও হয়নি ?'

ভুবন ধর তাঁর টাক মাথাটি নেড়ে বললেন, 'না। নিমি মোটেই অত সুন্দরী ছিল না। অমন টানা টানা চোখ, অমন চোখা নাক ছিল না তার। তোমার এ সব ছবি দেখে আমি আমাদের সেই নিমিকে চিনতে পারছিনে দাদু। তবে তোমার দোষ নেই। তুমি তো আর তাকে দেখোনি। আর দেখলেই বা কি। আমি তো দেখেছি, কোলে পিঠে করে মানুষ কবেছি। তার মুখ আমারই ভালো করে মনে পড়ে না এখন। সব যেন ঝাপসা হয়ে গেছে।'

অজয় বলল, 'আচ্ছা দাদু, মায়ের ফোটো টোটো কোথাও কিছু নেই।'

বুড়ো ভুবন ধর ফোকলা দাঁতে হাসলেন, 'তখন কি আর ওসব পাট ছিল ? আমাদের কাসিমপুরে ফোটো তোলার অত রেওয়াজই ছিল না।'

অজয় একটু চুপ করে থেকে বলল, 'থাকগে ফোটোর কথা। আপনি আমার মায়ের গল্প বলুন তো দাদু। আমি আপনার কাছ থেকে তাঁর কথা শুনব।'

যেন ছত্রিশ বছর বয়স্ক পুরুষ নয়, ছ-বছরের এক বালক এই প্রথম মায়ের অভাব টের পেয়েছে। মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দুনিয়া ভরে।

বৃদ্ধ ভুবন ধর পরম স্নেহে হাত রাখলেন অজয়ের পিঠে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'তার কথা আর কি শুনবে দাদু। সে এক দুঃখিনী অভাগিনীর কথা। ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা গেল। আত্মীয় স্বজন ধারে

কাছে কেউ ছিল না, পড়ল এসে আমাব ঘাড়ে। আমার ঘাড়ও তো শক্ত নয়। লিকলিক করে। অল্প বয়সে বিয়ে করেছি। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। কি করে তাদের মানুষ করব, মেয়েগুলিব বিয়ে থা দেব, সেই চিন্তায় অস্থির। এর ওপর আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটি।'

তিনি থামলেন।

অজয় সাগ্রহে বলল, 'তাবপব দাদু ?'

ভুবন ধর বলতে লাগলেন, 'তা মিথ্যে বলব না, নিমির আমার বুদ্ধি বিবেচনা ছিল। ও যে গরীব মামাব সংসারে আছে সে কথা ও সব সময় মনে বাখত। মামাতো বোনদেব হাত থেকে কাজ টেনে নিয়ে নিজে করত। আমার ছোট ছেলেমেয়েগুলি তো ওর কোলে কোলেই থাকত। ওরই মধ্যে লুকিযে লুকিয়ে আবার লেখাপডাও একটু শিখেছিল। রামায়ণ মহাভারতখানা পডতে পাবত। চিঠিখানা পত্তবখানা এলে ওই নিমিই পডত। লিখতেও শিখেছিল। হাতের অক্ষরেব ছাঁদ মন্দ ছিল না।'

'বলে যান দাদু।'

ভুবন ধব বললেন, 'বেশি বলবাব কি আছে। কতটুকুই বা জীবন। আর কিই বা তাব কথা। ভিত্তবটা ভালো হলে কি হবে, বাইরে থেকে তো লোকে কুচ্ছিতই দেখত। তাছাডা আমার অবস্থাও তেমন নয়, পাঠশালায় মাষ্টারি করি, দিন আনি দিন খাই। ভালো ঘব বব জোটাব কোত্থেকে। তাই দোজবরে বেশি-বযসী স্বামীব হাতেই দিতে হল নিমিকে। বললাম, 'মা, কিছু মনে করিসনে। এর বেশি তো আমার সাধ্য নেই।' নিমি মুখ নিচু করে বলল, 'মামা, আপনি দুঃখ কববেন না। ভাগ্যে থাকলে আমার ওখানেই সুখ হবে।' অথচ আমি জানতাম আমার অল্পবয়সী বড জামাই মেজো জামাইয়ের মতো বরের সাধ ওরও ছিল।'

অজয় বলল, 'তারপর দাদু ?'

দাদু বললেন, 'তা মিথ্যে বলব না। তোমার বাবা আমার নিমিকে অনাদর অযত্ন করেনি। তবে তোমাদের সংসারেব অবস্থাও তো তখন ভালো ছিল

না। বহু গুষ্টি। অভাব অনটন ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই ছিল। তোমার মার পক্ষ নিয়ে তোমার বাবা কিছু বলতে গেলে বাড়ির সবাই এক বাক্যে বলত, দ্বিতীয় পক্ষের বউ মাথায় উঠেছে। বাড়ির কর্তার পক্ষে এ তো বড়ো লজ্জা বড় কলঙ্কের কথা। গিরীন সেই খোঁটাকে ভয় করত, আর সেই ভয়েই স্ত্রীকে মাঝে মাঝে কড়া কথা, কটু কথা বলত। সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না, খুঁটিনাটি আমার মনেও নেই। বাড়ির ময়লা কাপড় কাচা নিয়েই বোধহয় ঝগড়াটা লেগেছিল। তোমার বাবাও দু-কথা বলে থাকবে।'

ভুবন ধর একটু থামলেন।

অজয় সাগ্রহে বলল, 'আপনি বলে যান দাদু, আমার কাছে কিছু লুকোবেন না।'

দাদু বললেন, 'না ভাই, লুকোবার কি আছে। তা আমার নিমিও তো কম জেদী ছিল না। জ্বর গায়ে বৃষ্টির মধ্যে তোমাদের এঁদো পুকুরের পাড়ে বসে সারা বাড়ির ময়লা কাপড় কেচে সন্ধ্যার সময় নেয়ে ধুয়ে এল। কারো মানা শুনলো না। এত রাগ স্বামীতে সহ্য করতে পাবে, শরীরে সইবে কেন দাদা। প্রথমে জ্বর জ্বর, তারপরে একেবারে ডবল নিউমনিয়া। চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। গঞ্জের বড় ডাক্তারকে তোমার বাবা এনেছিলেন। কিন্তু কিছুই হল না। মরবার কদিন আগে থেকে সে নাকি সকলের কাছে মিনতি করত, আমাকে তোমরা বাঁচাও। আমি আমার সোনাদের ফেলে, সুখের সংসার ফেলে যেতে চাইনে।'

'তারপর ?'

দাদু বললেন, 'তারপর আর কি। আমি খবর পেলাম সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর। গিয়ে আর দেখতে পাইনি।' এতকাল বাদেও দাদু কোঁচার খুঁটে ভিজে চোখ মুছলেন। অজয় মুছল না। ওর দু-চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। ভুবন ধর বাধা দিলেন না, ভাবলেন মায়ের জন্যে ছেলে তো কোনদিন কাঁদেনি, আজ কাঁদুক। খানিকক্ষণ বাদে উঠে পড়ল অজয়। বেলেঘাটা থেকে শেয়ালদা, শেয়ালদা থেকে পাইকপাড়ার বাস ধরল। ভাবতে

ভাবতে এল নিজের মায়ের কথা। তাঁর স্বল্প সংক্ষিপ্ত আখ্যান থেকে কোন্ অংশটুকু সে তুলিতে ফুটিয়ে তুলবে। আঁকবে কি তাঁর বাল্যের-কৈশোরের ছবি, না শ্বশুর বাড়ির একটি তরুণী বধূকে। না কি রোগশয্যায় শায়িতা একটি বধূর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাকে সে মূর্ত করে তুলবে। এবার সে পারবে, এবার সে নিশ্চয়ই আঁকতে পারবে। বিষয়ের আভাস সে পেয়েছে। শুধু চেহাবা আব মুখের আদলটি ঠিক আসি আসি করেও আসছে না। চোখের জলে বাব বাব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অন্যমনস্ক অজয় নিজেব বাসা ছাড়িয়ে কখন চলে এসেছে। বানী রোডেব মোড়ে বাস এসে থামতে তার খেয়াল হল। নেমে ফের উল্টো দিকে চলতে শুরু করল অজয়। ভাদ্রের কড়া রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে সে খেয়াল নেই। অসতর্কভাবে চলার জন্য একটা বাসের ড্রাইভার তাকে গালাগালি দিয়ে চলে গেল সে খেয়াল নেই। অজয় খুঁজছে, নিজের মনে মাকে খুঁজছে।

'দাদাবাবু যে! এই ভবদুপুরে ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?' চমকে উঠে মুখ তুলল অজয়। তাদেব ঠিকে ঝি সবলা। পাড়ার আরো তিন-চার বাড়িতে কাজ কবে। মণীন্দ্র রোডের গলি থেকে বেরিযে বোধ হয় বস্তির বাসাব দিকেই যাচ্ছে। তার ডাকে অজয় মুখ তুলল, চোখ তুলে তাকাল। ঝি সরলা, বছব চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়স। কালো বোগাটে চেহাবা। পরনে সেলাই কবা ময়লা একখানা খয়েবী পাড়ের শাড়ি। বছব পাঁচেকেব একটি উলঙ্গ ছেলে তার আঁচল ধরেছে। কোলের দু-বছব আড়াই বছরের মেয়েটি পথের মধ্যেই মায়েব স্তনে মুখ দিয়েছে। আব এক হাতে পুঁটলিতে বাঁধা ভাত তবকারি। আস্তে আস্তে চলছে সরলা। ওর আবারও ছেলেপুলে হবে।

'কোথায় গিয়েছিলেন দাদাবাবু?'

সরলা আবাব হেসে জিজ্ঞাসা করল।

অজয় বলল, 'এই একটু ওদিকে। তুমি কোত্থেকে আসছ।'

সরলা বলল, 'চক্কোত্তিরা খেতে বলেছিলেন। তাঁর ছেলের আজ মুখে ভাত

কিনা। বুড়ী শাশুড়ীর জন্যে দুটি চেয়ে নিয়ে গেলাম। সে তো নড়তে পারে না।'

অজয় বলল, 'বেশ তো।'

চলে যাওয়ার আগে আর একটু দাঁড়াল সরলা, একটু ইতস্তত করে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ দাদাবাবু, এই ইংরেজি মাস শেষ হতে আর কদিন বাকি।'

অজয় বলল, 'কেন রে?'

সরলা মৃদুস্বরে বলল, 'এমাস শেষ হলে সে ছাড়া পাবে দাদাবাবু।'

অজয়েব মনে পডল চুরিব দায়ে ওর স্বামী গোকুল দাসেব তিন মাসেব জেল হয়েছিল।

আর একবার তাকিয়ে বাকিটুকু দেখে নিল অজয়। সরলার সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে মোটা শাঁখা। ঠোটে লজ্জিত হাসি।

অজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সরলা বলল, 'রোদে বোদে আর না ঘুরে একটু বাড়ি যান দাদাবাবু। ঈস মুখখানা একেবাবে শুকিয়ে গেছে।' অজয় মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, এবার সে বাডিতেই ফিববে। সে পেয়েছে, এবার সে পেয়েছে।

ছদ্মনাম

যাদুঘরে নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীতে নানা বয়সী নানা শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে এই কাহিনীর নায়িকা নমিতা মৈত্র ছবি দেখে বেড়াচ্ছিল। তার বয়স বছব বাইশেক। গায়ের রং শ্যামলা, ছিপছিপে দোহারা গডন, একটু লম্বাটে ধবনের মুখ, নাকটি তীক্ষ্ণ, চোখ দুটি বড বড আব কালো। জানি না এই রূপ বর্ণনায় মেয়েটিব মুখ পাঠকেব কল্পচোখে কতখানি বাস্তব হয়ে উঠবে। তবে ভরসা এই বাঙ্গালী মেয়ের এই ধরনেব চেহাবা, এই ধরনের মুখের সঙ্গে কমবেশি অনেকেরই পরিচয় আছে। সেই পবিচিতাদের সঙ্গে এই অপরিচিতা নায়িকাকে তাঁবা মিলিযে নিতে পাববেন।

নমিতার মুখে শুধু করুণ গাম্ভীর্য নয় ক্লান্তির ছাপও ছিল। হয়ত অফিসের খাটুনির পবে এই প্রদর্শনীতে এসেছে বলেই তাকে এমন দেখাচ্ছিল। ওর হাতে প্রদর্শনীব একটা ক্যাটালগ। কিন্তু তালিকাব সঙ্গে ছবির নম্বর মিলিয়ে চিত্র-পরিচয় জানবাব তাব যেন তেমন আগ্রহ কি উৎসাহ ছিল না, তালিকাটি বন্ধ করেই সে এ-ঘব থেকে ও-ঘরে ঘুবে বেডাচ্ছিল। পেইনটিং, স্কেচ, এচিং— চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগগুলি সে ঘুবে ঘুরে দেখল। কত নামজাদা, কত অখ্যাতনামা তরুণ শিল্পীর ছবির সামনে নমিতা থেমে থেমে দাঁডাল, কিন্তু কিছুই যেন তার চোখকে মুগ্ধ, মনকে আকর্ষণ করল না।

তরুণ বয়স্ক দুজন দর্শক তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখছিল। তারা কখনো পাশে দাঁড়াচ্ছিল, কখনো পিছনে।

এক সময় সেই দুই বন্ধুর মৃদু আলাপ নমিতার কানে গেল।

'সবাই কি ছবি দেখতে আসে। কতজনের কত উদ্দেশ্য থাকে। কেউ দেখাতে আসে, কেউ বা দেখা করতে। একজিবিশনে আসাটা ফ্যাশান বলেই কাউকে কাউকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়।'

কিনা। বুড়ী শাশুড়ীর জন্যে ছুটি চেয়ে নিয়ে গেলাম। সে তো নড়তে পারে না।'

অজয় বলল, 'বেশ তো।'

চলে যাওয়ার আগে আর একটু দাঁড়াল সরলা, একটু ইতস্তত করে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ দাদাবাবু, এই ইংরেজি মাস শেষ হতে আর কদিন বাকি।'

অজয় বলল, 'কেন রে?'

সরলা মৃদুস্বরে বলল, 'এমাস শেষ হলে সে ছাড়া পাবে দাদাবাবু।'

অজয়ের মনে পড়ল চুরির দায়ে ওর স্বামী গোকুল দাসের তিন মাসের জেল হয়েছিল।

আর একবার তাকিয়ে বাকিটুকু দেখে নিল অজয়। সরলার সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে মোটা শাঁখা। ঠোঁটে লজ্জিত হাসি।

অজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সরলা বলল, 'রোদে রোদে আর না ঘুরে একটু বাড়ি যান দাদাবাবু। ঈস্ মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।' অজয় মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, এবার সে বাড়িতেই ফিরবে। সে পেয়েছে, এবার সে পেয়েছে।

ছদ্মনাম

যাদুঘরে নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীতে নানা বয়সী নানা শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে এই কাহিনীর নায়িকা নমিতা মৈত্র ছবি দেখে বেড়াচ্ছিল। তার বয়স বছর বাইশেক। গায়ের রং শ্যামলা, ছিপছিপে দোহারা গড়ন, একটু লম্বাটে ধরনের মুখ, নাকটি তীক্ষ্ণ, চোখ দুটি বড় বড় আর কালো। জানি না এই রূপ বর্ণনায় মেয়েটির মুখ পাঠকের কল্পচোখে কতখানি বাস্তব হয়ে উঠবে। তবে ভরসা এই বাঙ্গালী মেয়ের এই ধরনের চেহারা, এই ধরনের মুখের সঙ্গে কমবেশি অনেকেরই পরিচয় আছে। সেই পরিচিতাদের সঙ্গে এই অপরিচিতা নায়িকাকে তাঁরা মিলিয়ে নিতে পারবেন।

নমিতার মুখে শুধু করুণ গাম্ভীর্য নয় ক্লান্তির ছাপও ছিল। হয়ত অফিসের খাটুনির পরে এই প্রদর্শনীতে এসেছে বলেই তাকে এমন দেখাচ্ছিল। ওর হাতে প্রদর্শনীর একটা ক্যাটালগ। কিন্তু তালিকার সঙ্গে ছবির নম্বর মিলিয়ে চিত্র-পরিচয় জানবার তার যেন তেমন আগ্রহ কি উৎসাহ ছিল না, তালিকাটি বন্ধ করেই সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পেইনটিং, স্কেচ, এচিং— চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগগুলি সে ঘুরে ঘুরে দেখল। কত নামজাদা, কত অখ্যাতনামা তরুণ শিল্পীর ছবির সামনে নমিতা থেমে থেমে দাঁড়াল, কিন্তু কিছুই যেন তার চোখকে মুগ্ধ, মনকে আকর্ষণ করল না।

তরুণ বয়স্ক দুজন দর্শক তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখছিল। তারা কখনো পাশে দাঁড়াচ্ছিল, কখনো পিছনে।

এক সময় সেই দুই বন্ধুর মৃদু আলাপ নমিতার কানে গেল।

'সবাই কি ছবি দেখতে আসে। কতজনের কত উদ্দেশ্য থাকে। কেউ দেখাতে আসে, কেউ বা দেখা করতে। একজিবিশনে আসাটা ফ্যাশান বলেই কাউকে কাউকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়।'

'আস্তে হে আস্তে, শুনতে পাবে। তোমার ছবি মন দিয়ে দেখেনি বলেই তো তোমার এই বিদ্বেষ। কিন্তু আর্টিস্টকে অবিচল থাকতে হয়। মা ফলেষু কদাচন। কে তোমার ছবির নিন্দা করলে কে বন্দনা গাইলে, কে চোখ মেলে দেখল, কে দেখল না তা নিয়ে শিল্পীকে ভাবলে চলে না। তোমার যা দেখবার দেখে নাও। একটি ভালো প্রফাইল লক্ষ্য করেছ ?'

'করেছি। আমি ভাবছি সিঁথিতে সিঁদুর দেব কি দেব না। দিলেই ভালো মানাবে, নাকি যেমন শাদা আছে তেমনিই থাকবে ? তোমার কি মত।'

এর পর নমিতা তরুণ শিল্পী আব শিল্পীব বন্ধুর সঙ্গ এড়িয়ে প্রদর্শনী ঘরের বাইবে দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং ধবে এসে দাঁড়াল। কম্পাউণ্ডের ওধাবে নাম না জানা বড় বড় পাতাওয়ালা একটি গাছ সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। সবুজ পাতায় সূর্যাস্তের রঙ। নমিতা কিছুক্ষণ এই নতুন ছবিটির দিকে অপলকে তাকিয়ে বইল।

এ ছবি নতুন আবার এ ছবি পুরনো। গত দুবছর ধবে প্রদর্শনী ঘব থেকে বেরিয়ে ঠিক এই বেলিংটিতে ভর করে পাতার সবুজে সূর্যাস্তের ছিটে দেখেছে নমিতা! তবু গত দুবছরের সঙ্গে এ বছরের একটু প্রভেদ আছে। আজ আব একজন তার পাশে দাঁড়ান নেই। এ প্রভেদ একটু নয়, অনেকখানি। আজ সে নমিতাব পাশে নেই, কাছে নেই, এই কলকাতা শহরের পাশাপাশি অফিসে থেকেও সে অনেক দূরে চলে গেছে। একই পাড়ায় বাস করেও যেন সাত সমুদ্র তের নদীর দুই পারে চলে গেছে তারা।

দুবছর আগে এই প্রদর্শনীতেই তার সঙ্গে নমিতার আলাপ হয়েছিল, উদ্বোধনের পর দিন দুই গেছে। সেদিনও খুব ভিড, ইনচার্জকে বলে অফিস থেকে একটু সকাল সকালই বেরিয়েছে নমিতা। আরো দুটি বান্ধবীর আসার কথা ছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়নি। স্থির চিত্রের চেয়ে চলচ্চিত্রে তাদের আগ্রহ বেশি, কিন্তু স্থিবও যে কত অস্থির হতে পারে নমিতা সেই

দৃশ্যই একখানি ছবির মধ্যে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ছবিখানির নাম সমুদ্রে ঝড়। নমিতার একজন প্রিয় শিল্পীর আঁকা, বর্ণবিলাস আর বিচিত্র রঙের সমারোহে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন।

দেখতে দেখতে খেয়াল ছিল না। হাত থেকে অসাবধানে ক্যাটালগখানা পড়ে গিয়ে একটু শব্দ হলো। চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবকও সেই 'ঝড়' দেখছিল। তাড়াতাড়ি ক্যাটালগখানা তুলে নিয়ে নমিতার দিকে এগিয়ে দিল।

নমিতা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

যুবকটি হেসে বলল, 'অনুবাদটুকু ভালো নয়। আমি হলে বলতাম, ধন্য। বাদটুকু একেবারে বাদ দিতাম।'

নমিতাও এবার হাসল, 'এত বেশি অনুপ্রাসই কি ভালো।'

দুজনে ছবি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল।

যুবকটি বলল, 'আপনাকে আমি চিনি। আপনি তো ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ করেন।'

নমিতা বলল, 'হ্যাঁ। আপনাকেও পাশের এ জি বেঙ্গলে রোজ ঢুকতে দেখি।'

সে বলল, 'আপনি তো কালীঘাট থেকে নটা-বিশের ট্রামে আসেন।' নমিতা স্মিতমুখে বলল, 'হ্যাঁ, আপনাকেও তো ওই ট্রামে মাঝে মাঝে দেখতে পাই।'

'মাঝে মাঝে নয়। আমার পক্ষে রোজ এলেই সুবিধে, মানে অফিসে লেট হতে হয় না। কিন্তু রোজ ওই ট্রামটা ধরতে পারিনে। আমি চিরকালের লেটলতিফ।'

খানিক বাদে সে প্রস্তাব করল, 'চলুন না, ওই বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়াই। এত ভিড়ের মধ্যে ছবি দেখে সুবিধে হবে না।'

নমিতা বলল, 'চলুন।'

তারপর দুজনে এসে এই রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য প্রথম

দিন খুব কাছাকাছি নয়। মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখেছিল তারা।

সে একটু বাদে বলল, 'দেখুন, এত ঘন ঘন আমাদের দেখা হয়, তবু আলাপ পরিচয় হয় না। সভ্য শহবের কি অদ্ভুত নিয়ম, আমি বলব অসভ্য নিয়ম। ভাগ্যিস্ ক্যাটালগটা আপনাব হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

নমিতা স্মিতমুখে বলল, 'একে আপনি ভাগ্য বলেন।'

সে হেসে বলল, 'নিশ্চযই, দৈবের অনুগ্রহ। অবশ্য আমার একজন বাস্তববাদী লেখক বন্ধু আছেন তিনি দৈব মানেন না। তিনি যদি আমাদের নিয়ে গল্প লেখেন, নিশ্চয়ই লিখবেন আপনি ইচ্ছে কবেই বইটা ফেলে দিয়েছেন।'

নমিতা লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদের সুরে বলল, 'মোটেই না। তিনি আমাদের নিযে গল্প লিখতে যাবেন কেন।'

সে বলল, 'আমরা বললেই তিনি লিখবেন। চেনা মানুষকে নিয়ে তাঁর গল্প লেখা অভ্যাস।'

নমিতা বলল, 'কি সাংঘাতিক। ভারি অসভ্য তো।'

তাবপর একটু মুচকি হেসে নমিতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, 'আপনিই সেই লেখক নন তো!'

সে বলল, 'না না। আমি পাঠক, কথক, সমালোচক। লেখক ছাড়া সবই, আর যারা লেখক তাবা লেখক ছাডা আর কিছুই না।'

একটু বাদে সে বলল, 'আমিই শুধু কথা বলছি। আপনি কিছুই বলছেন না। এতখানি আলাপই যখন হলো, আমরা এবার আমাদের নাম ধাম জিজ্ঞেস করে নিতে পারি।'

নমিতা মৃদুস্বরে নিজেব নাম বলল।

সে বলল, 'দেখুন, আপনার কাছে আমার নাম বলতে বড লজ্জা হচ্ছে। আমার নামটা আপনাব মত অত বিনয়নম্র নয়।'

'তা নাই বা হলো, বলুন না।'

'আমার নাম রাজ্যেশ্বর দত্ত। এই গণতন্ত্রের যুগে এ-নাম মোটেই বলবার

যোগ্য নয়। কিন্তু আমাকে দোষ দেবেন না। নামটা আমার বাবার দেওয়া।'

সেই প্রথম দিনের পরিচয় দ্বিতীয় দিন থেকেই প্রায় দৈনন্দিন আলাপে গিয়ে পৌঁছল। আলাপ আব আলোচনা। অফিস ছুটিব পর সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব। অফিস ছুটির পব গার্ডেন, লেক, গঙ্গার ধার, শহরের খ্যাত অখ্যাত বেস্টুরেণ্ট।

বছব ঘুবে আবার এল প্রদর্শনী। ছবি দেখা শেষ করে আবার তারা দাঁড়াল রেলিং ধবে। একদিন নয় রোজ। কত পুরনো শিল্পীকে যে তাবা নাকচ করল কত নতুন শিল্পীকে তুলে ধরল তার ঠিক নেই।

রাজ্যেশ্বর একদিন বলল, 'আজ আর নিজের নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে না।'

নমিতা বলল, 'কেন।'

রাজ্যেশ্বব বলল, 'এমন একটি দেশের সন্ধান পেয়েছি, যেখানে আজও বাজতন্ত্র আছে।'

নমিতা বুঝেও না-বোঝার ভান করে বলল, 'তেমন দেশের অভাব কি। গণতন্ত্রের নামে বাজতন্ত্র এখনো বেশির ভাগ দেশে চালু।'

বাজ্যেশ্বর বলল, 'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন। আমি সে দেশের কথা বলছি না। এদেশের কথাও না। আমি একটি বিশেষ দেশের কথাই বলছি।'

নমিতা বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি বড অসভ্য।'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'আমাকে শেষ করতে দাও। তার নাম্ হৃদয় দেশ। সেখানে গণতন্ত্র নেই, আছে মনতন্ত্র। সে রাজ্যে শুধু রাজা আর রানী। প্রজা বলে কোন পদার্থ নেই।'

তাবপর খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে বাজ্যেশ্বর হঠাৎ বলল, 'নমিতা, আর কতদিন আমরা অপেক্ষা করব।'

এ যেন আর এক মানুষ। বাকপটু রাজ্যেশ্বরের কথা নয়। তার ভাষায় আবেগ, ভঙ্গীতে কাতরতা।

নমিতা একটু হেসে বলল, 'এবার বুঝি আর তোমার অনুপ্রাসে কুলালো না।'

রাজ্যেশ্বর হাসল না, বলল, 'আমার কথার জবাব দাও।'

নমিতা মৃদুস্বরে বলল, 'আমি তো তোমাকে সব বলেছি।'

তা ঠিক। এই এক বছর ধরে তারা শুধু সাহিত্য আর শিল্পের আলোচনাই করেনি; নিজেদের সংসারের কথা, পরিবার পরিজনের কথাও দুজনে দুজনকে জানিয়েছে।

নমিতার বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। নেহাৎ অভাব অনটনে পড়েছেন বলে মেয়েকে বি. এ. পাশ করিয়ে চাকরিতে দিয়েছেন। তাই বলে মেয়ের অসবর্ণ বিয়ে তিনি মোটেই অনুমোদন করবেন না। নমিতা তার বাবার সঙ্গে রাজ্যেশ্বরের আলাপ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মেয়ের এই বন্ধুটিকে মোটেই তাঁর ভালো লাগেনি। শুধু কায়স্থ বলে নয়; কায়েতের মধ্যে কি ভালো লোক নেই? ভালো ছেলে নেই? কিন্তু রাজ্যেশ্বর বড় দাম্ভিক, বড় আত্মম্ভরী, সবজান্তা ধরনের ছেলে। চালচলন থেকে শুরু করে পোশাক পরিচ্ছদের আরো অনেক ত্রুটির কথা তিনি বলেছেন। নমিতা যদিও জানে কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যেশ্বরকে সে এত পছন্দ করেছে বলেই তার বাবার তাকে এত অপছন্দ তবু জোর করে সে কথাটা নমিতা বাবাকে বলতে পারছে না। তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছেন। ডাক্তার মোটেই ভরসা দিচ্ছে না। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নমিতার মা নেই। বাবা তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। নমিতা যদি তাঁর অমতে বিয়ে করে তিনি তাঁর আরো তিনটি নাবালক ছেলে-মেয়ে নিয়ে বরং না খেয়ে মরবেন, তবু নমিতার দেওয়া একটি পয়সা তিনি ছোঁবেন না। সেও এক আশঙ্কা। এখন নমিতার আয়েই সংসার চলে।

এ দিকে রাজ্যেশ্বরের সমস্যাও কম নয়। তার বাবা মাও দরিদ্র। ঘরে বিধবা বউদি আর ভাইপো ভাইঝি আছে। আর আছে একটি অনূঢ়া বোন। বয়সে সে নমিতার চেয়েও বছরখানেকের বড়। দেখতে আরো কালো, মুখশ্রীও নমিতার মত সুন্দর নয়। তাছাড়া সে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। থার্ড ক্লাস অবধি বিদ্যা। নমিতার মত চাকরিবাকরি করে খাবে, কি নিজে পছন্দ

মত বর জুটিয়ে দেবে এমন সাধ্য তার নেই। তারতো সব ছেলেকেই পছন্দ। কিন্তু ছেলেরা তাকে পছন্দ করে কই। রাজ্যেশ্বরের বাবা বলছেন, 'তুমি বিয়ে করে সেই টাকায় বোনেব বিয়ে দাও।' নিত্য নতুন সম্বন্ধও তিনি নিয়ে এসেছেন। রাজ্যেশ্বর ঘাড় কাত করলেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা না হোক, সাত আটশ টাকা পণ, পনর কুড়ি ভরি সোনার সঙ্গে সুন্দরী, শিক্ষিতা বউ ঘরে আনতে পারেন। রাজ্যেশ্বরের যখনই বিয়ের আলোচনা হয়, তার বোনের চোখ উল্লাসে ভরে ওঠে, দাদা যতবার 'না' করে ততবার সেই চোখ দুটি নৈরাশ্যে এমন বিবর্ণ হয়ে যায়, যে এক অদ্ভুত ব্যথায় রাজ্যেশ্বরের বুকের মধ্যে মোচড দিয়ে ওঠে। নমিতার সঙ্গে তার বোনের কোন মিল নেই। কিন্তু চোখ দুটির সঙ্গে ভারি সাদৃশ্য আছে। তার চোখও অমনি কালো, অমনি শান্ত, অমনি মমতায় ভরা।

বিনা পণ যৌতুকে নমিতাকে বিয়ে করলে রাজ্যেশ্বরের বাবাও অবশ্য হতাশ আর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু সে তাঁকে বোঝাতে পারবে যে নগদ সাতশত টাকা পণ পাচ্ছে না বটে কিন্তু দেড়শ টাকা মাইনের চাকরি করা বউকে ঘরে আনছে। পাঁচ ছ মাস যদি বউয়ের মাইনের টাকা জমানো যায় তা হলেই বোনের বিয়ের পণ জোগাড় হয়ে যাবে। অবশ্য টাকাটা সত্যি-সত্যিই নমিতার কাছ থেকে নেবেনা রাজ্যেশ্বর, নিলে নমিতার বাবা আর ভাই বোনদের চলবে কি করে। শুধু নিজের বাবা মাকে বুঝ দেওয়ার জন্যেই ওসব কথা বলবে। তারপর বিয়ে হয়ে গেলে দুজনে পার্ট টাইম চাকরি করবে, ট্যুইশন করবে, রাত জেগে নোট লিখবে। অর্থ রোজগারের কত উপায় আছে। মাস কয়েক কি বড জোর বছর খানেক খাটলেই রাজ্যেশ্বরের বোনের বিয়ে দিতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

নমিতা বলেছে, 'সে ভাবে টাকা রোজগার তো এখনো করা যায়। তার জন্যে তাড়াতাড়ি বিয়ের কি দরকার।'

একথা শুনে আহত রাজ্যেশ্বর একটুকাল চুপ করে থেকে বলেছে, 'কিন্তু বাবা যে দিনরাত তাগিদ দিয়ে দিয়ে আমার মন বিষাক্ত করে তুলেছেন।'

নমিতা জবাব দিয়েছে, 'কিন্তু আমার বাবা যে সহ্য করতে পারবেন না। তিনি আর কদিনই বা আছেন ? যা অবস্থা তাঁর শরীরের।'

রাজ্যেশ্বর আর কিছু বলেনি।

তারপর এই মাস ছয়েক আগের কথা। অফিস ছুটির পর রাজ্যেশ্বর সেদিন গম্ভীর মুখে নমিতাকে ডেকে নিয়ে গেল, 'তোমাব সঙ্গে কথা আছে।'

নমিতা মনে মনে হাসল, কথা যেন কোন দিনই থাকে না। গড়ের মাঠের অনেকখানি পাডি দিয়ে এক নির্জন জায়গায় বসে পড়ল বাজ্যেশ্বব। তারপর বিনা ভূমিকায় বলল, 'গীতা কি করেছে জানো ?'

নমিতা বলল, 'না।'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'পাড়ার বকাটে ছোকবা গোবিন্দ শীলের সঙ্গে নাকি চিঠি লেখালেখি করছিল। ধবা পড়ে গেছে। ভাড়াটে বাড়ি। আরো পাচ ঘর বাসিন্দা আছে। সবাই হাসাহাসি করছে। বাবা তো বেগে আগুন। বলছেন, ভাই যে পথ নিয়েছে বোনও সেই পথ নেবে, ওর দোষ কি।'

নমিতা আস্তে আস্তে বলল, 'ছেলেটি কেমন ?'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'কোন কাজকর্ম করে না। মদ গাঁজা সবই চলে। গুণের অবধি নেই।'

নমিতা বলল, 'বড়ই লজ্জার কথা। ভাবি দুঃখ হচ্ছে শুনে।'

রাজ্যেশ্বর উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মোটেই না। তোমার মোটেই দুঃখ হয় নি। আমাদের পরিবারের মান সম্মানের দিকে তোমার মোটেই দৃষ্টি নেই। তা যদি থাকত তাহলে তুমি আমাব কথা শুনতে।'

নমিতা কাতরভাবে বলল, 'কি করে শুনি বল। বাবা যে কিছুতেই—'

রাজ্যেশ্বরের আব ধৈয রইল না, বলে উঠল, 'কেবল বাবা আর বাবা। সেই বে-আক্কেল নির্বোধ বুড়ো কতকাল আর তোমাকে আগলে রাখবে ?'

নমিতা স্থির দৃষ্টিতে এবার রাজ্যেশ্বরের দিকে তাকাল। তার কালো চোখে আগুনের ঝলক দেখা দিল। তীব্র ঝাঁঝালো গলায নমিতা বলল,

'তোমার মত স্বার্থপর পশুর হাত থেকে যতকাল আগলে রাখতে পারেন ততই ভালো।'

এরপর তুজনে নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে এল। সারাটা পথ কেউ কারো সঙ্গে কোন কথা বলল না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গেল কেউ কারো কাছে এসে ক্ষমা চাইল না। ট্রামে বাসে এখনো মাঝে মাঝে তাদের দেখা হয়। কিন্তু তারা আগের মতই—না আগেব চেয়েও বেশি পরস্পবের কাছে অপরিচিত। সম্পর্কের স্বাভাবিক ছেদ তারা মেনে নিয়েছে। বাজ্যেশ্বরের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু নমিতা তাতে কান দিচ্ছে না। বিলাত ফেরত ডাক্তার সুধীর লাহিড়ীব সঙ্গে নমিতার সম্বন্ধ এসেছে। তিনি ওদের দুব সম্পর্কেব আত্মীয়। তাঁকে নিকট আত্মীয় কববার জন্যে নমিতাব বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। লাহিড়ী উদার স্বভাব, মিতভাষী। নমিতাকে দেখে তাঁর পছন্দ হয়েছে। কিন্তু নমিতা তাঁর কাছ থেকে কিছুদিন সময় নিয়েছে।

উর্দিপবা বেয়ারা এসে বলল, 'মাইজী, ঘর বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। বাবু বাগ কবছেন।'

নমিতার চমক ভাঙল। এতক্ষণ কোথায় ছিল সে। কার কথা ভাবছিল। ছি ছি ছি। লজ্জিত হয়ে বলল, 'চল যাচ্ছি।'

প্রদর্শনীর হল ঘবগুলি প্রায় শূন্য। তুএকজন চাকর বেয়ারা ছাড়া আর কেউ নেই। আব আছেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। বড একখানা টেবিলের সামনে বসে তিনি খাতাপত্র গোছাচ্ছেন। নমিতাকে দেখে কালো রঙের লম্বা খাতাটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বিরক্তভাবে বললেন, 'নিন সই করুন। আপনাবা তো ছবি দেখতে আসেন না।—'

নমিতা লজ্জিতভাবে খাতাটা নিজের দিকে টেনে নিল। যারা প্রদর্শনী দেখতে আসে, নিজেদের নাম ঠিকানা এই খাতায় লিখে দিয়ে যায়। গত তুবছর বাজ্যেশ্বর আর নমিতাও লিখেছে। পর পর তুজনের নাম। কিন্তু

এবার একা একাই নাম সই করতে হবে নমিতার। সেও কি একা একা এসেছিল? সেই উদ্বোধনের দিন থেকে তিন দিনের কয়েকটি পাতায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেল নমিতা। না, সে নাম কোন পৃষ্ঠায় নেই। নমিতার নাম থেকেই বা তাহলে কি হবে!

চশমাপরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ফের তাড়া দিলেন, 'কি দেখছেন অত! নামটা লিখতে হয় লিখে ফেলুন না।'

কি হবে নিজের নাম সই করে? নমিতা যে তার খোঁজে এসেছিল, কি হবে সেই পরাজয়ের চিহ্ন রেখে? একটুকাল কি যেন চিন্তা করল নমিতা তারপর নিজের নামের বদলে নমিতা অফিসের আর একটি মেয়ের নাম বসিয়ে দিল—শিবানী রায়।

ভদ্রলোক খাতাটা বন্ধ করে বললেন, 'বাঁচালেন। আশ্চর্য কাণ্ড আপনাদের। কালও এক কোট প্যাণ্ট পরা দেশী সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা খাতাটার নাম মুখস্থ করছিলেন। আমি চোখ কটমট করে তাকাতেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, শেষ পর্যন্ত নিজের নামটা আর লিখে যান নি। কত রকমের লোকই যে আসে এখানে।'

নমিতা সাগ্রহে বলে উঠল, 'সত্যি? কি রকম চেহারা বলুন তো?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাপ করবেন, চেহারা কি আমি মুখস্থ করে রেখেছি, একজিবিশনে রোজ হাজার হাজার লোক আসে যায়। সকলের চেহারার বর্ণনা দিতে হলেই হয়েছে।'

বেয়ারাকে জানলা দরজা বন্ধ করার ইঙ্গিত দিলেন ভদ্রলোক।

নমিতা একা একা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। তাহলে কি সেও এসেছিল? সেও কি নমিতার মত প্রতি মুহূর্তে আর একজনের খোঁজ করছিল! খাতায় একটি নাম খুঁজছিল আতিপাতি করে? কোন প্রমাণ অবশ্য নেই। কিন্তু নমিতা যে এসেছিল তারও কি কোন প্রমাণ রইল!

চাঁদা

জীবনের অনেক বড় বড় প্রশ্নের উত্তর মেলে না। কিন্তু সেই উত্তর-না-মেলা প্রশ্নগুলি আমরা মেনে নিই। দৈনন্দিন জীবনে সেগুলির দুরূহতা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নিস্পৃহ হয়ে থাকি, এমন কি তাদের অস্তিত্বই টের পাইনে। কিন্তু অনেক সময় তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছোটখাট হেঁয়ালিকে অত সহজে ভোলা যায় না। সেই জবাব-না-পাওয়া ধাঁধাগুলি আমাদের মনে থেকে যায়, এমন কি কোন কোন সময় কাঁটার মত বেঁধে।

এবারকার সরস্বতী পূজোর দিন-তিনেক আগের একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমার প্রায়ই এ কথাগুলি মনে হয়। আজও কাজের আর অকাজের কাগজে বোঝাই ড্রয়ারটা পরিষ্কার করতে গিয়ে ছেলেদের নানা ক্লাবের কয়েকখানা চাঁদার রসিদ দেখে ব্যাপারটা ফের মনে পড়ে গেল।

এই রসিদগুলির মধ্যে একখানি রসিদের একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

সেদিনও সকাল বেলায় ঘরে বসে লিখবার চেষ্টা করছিলাম। শ্রীপঞ্চমী আসন্ন। আমার কলমে বাণী আসুন আর না আসুন—দোরের কাছে, জানলার কাছে বাণীর পূজারীদের আসবার বিরাম ছিল না। দু-তিনটি ছেলেয় মিলে একেকটি করে দল, একেকটি করে ক্লাব। জানলার কাছে মুখ বাড়িয়ে একজন তাদের মুখপাত্র হয়ে বলছে, 'দাদা, আমাদের চাঁদাটা।'

পাঁচ বছরের ছেলের দলও আছে, পঁচিশ বছরের যুবকের দলও আছে। সকলের মুখেই দাদা আর চাঁদা। কান ঝালাপালা হয়ে উঠছিল। কোন দলকে সিকিটা আধুলিটা দিচ্ছিলাম, কোন কোন দলকে সব ক্লাব মিলিয়ে একটি ক্লাব করবার অবান্তর উপদেশ, কোন দলকে পরদিন আসবার ওয়াধা। কিন্তু কেউ সন্তুষ্ট হচ্ছিল না। যাদের সিকি দিচ্ছি তারা আধুলি চায়, যারা আধুলি পাচ্ছে, তারা টাকা। আর যাদের ভাগে শুধু উপদেশ আর ওয়াধা জুটছে

তারা নগদ বিদায় না নিয়ে নড়তে চাইছে না। কোন রকমে তাদের হাত এড়িয়ে গল্পে মন দিয়েছি, ফের কড়া নড়ে উঠল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, 'কে?'

জবাবটা শোনবার দরকার হল না। দেখেই বুঝতে পারলাম।

এবার আর ছেলের দল নয়। একটি মেয়ে। বছর চব্বিশ পঁচিশ হবে বয়স। সিঁথিতে সিঁদুর। পরনে আটপৌরে একখানি মিলের শাড়ি। হাতে কাঁচের আর প্লাস্টিকের চুড়ি। পায়ে পুরনো স্যাণ্ডেল।

বললাম, 'কি চাই আপনার?'

মেয়েটি বলল, 'দাদা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে বললাম, 'বলুন।'

মেয়েটি এবার মিষ্টি করে একটু হাসল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলব? ভিতরে কি একটু আসতে পারিনে? দরজা কি বন্ধ?'

কথা বলবার কায়দা জানে। অভ্যাসটা দু একদিনের নয়। বেশ হাত পাকিয়েছে। তবু হাজার হোক, মেয়ে। ভিতরে যখন আসতে চাইছে, না করতে বাধল।

দরজাটা খুলে দিয়ে বললাম, 'আসুন।'

মেয়েটি ভিতরে এলে আমি তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

বিনা আপত্তিতে চেয়ারটায় মেয়েটি বসল, তারপর আমার টেবিলের দিকে চেয়ে লজ্জিত ভঙ্গীতে হেসে বলল, 'আপনার কাজের ব্যাঘাত করলাম।'

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, 'আমার কাজের জন্যে ভাববেন না, আপনার কাজের কথা বলুন এবার।'

তবু ঘরখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মেয়েটি আর একটা অকাজের কথা বলল, 'বউদি কোথায়?'

এই আত্মীয়-সম্বোধনের ভঙ্গী দেখে আমি ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম। আলাপ নেই পরিচয় নেই, তবু দাদা আর বউদি। মেয়েটি নিশ্চয়ই ঝানু। পেশাও দু একদিনের নয়। যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে তাতেই

বেশ বুঝতে পেরেছি। এখন কী চায়, আর কী ছলে চায় তাই বুঝতে পারলেই হত।

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছে। ও-বেলা আসবে। আপনার কি তাকেই দরকার?'

মেয়েটি আবার একটু হাসল, 'দরকার তো আপনার কাছেই দাদা। তবে মেয়েদের দুঃখ মেয়েরা যেমন বোঝে—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'বুঝিয়ে বললে পুরুষরাও যে একটু আধটু না বুঝতে পারে তা নয়। আপনি কিজন্যে এসেছেন তাই বলুন।'

মেয়েটি বলল, 'দেখুন, আমিও ভদ্রঘরের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী। কেবল অবস্থার ফেরেই এই দশা।'

বললাম, 'আপনি থাকেন কোথায়?'

'থাকি? এখন থাকি ওই নেতাজী কলোনিতে। নাগের বাজারের কাছে। বড় রাস্তার ওপরেই।'

'কে কে আছেন?'

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল, 'স্বামী আছেন।'

বললাম, 'ছেলেমেয়ে?'

মেয়েটি এবার একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল, 'না ওসব কিছু হয়নি। নিজেরাই খেতে পাইনে, ওসব হলে কি আর রক্ষে ছিল?'

জানলার কাছে আবার কয়েকটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে হাফপ্যাণ্ট। আট থেকে বছর বারোর মধ্যে বয়স। আমাদের দুজনের চোখই তাদের উপর গিয়ে পড়ল।

বললাম, 'কি চাই?'

একটি ছেলে বলল, 'সরস্বতী পূজোর চাঁদা।'

ধমকের ভঙ্গীতে বললাম, 'এখন হবে না, যাও। আজ সকাল থেকে অন্তত গুটিদশেক ক্লাবকে চাঁদা দিতে হয়েছে।'

'আমাদের দেননি। আমাদের ক্লাবের নাম বাণী সঙ্ঘ।'

বললাম, 'এখন ঘুরে এস। দেখছ না কথা বলছি ?'

একটি ছেলে বুদ্ধিমানের মত বলল, 'চল না, ও-বাড়ির চাঁদাটা আগে নিয়ে আসি। তারপর এখানে ফের আসব।'

বাণী সঙ্ঘের দল চলে গেলে আমি আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, কি বলছিলেন।'

মেয়েটি বলল, 'বলতে বড লজ্জা হয়। কোন দিন তো বলতে হয়নি, কারো কাছে হাত-পাততে হয়নি এমন করে। কিন্তু কি করব, অবস্থার গতিকে সবই মানুষকে করতে হয়। নইলে আমি কি ভেবেছিলাম আমাকে এমন করে দোরে দোরে হাত পেতে বেড়াতে হবে ?'

মেয়েটির গলা এবাব করুণ শোনাল।

বললাম 'কিসের জন্যে হাত পাতছেন ?'

মেয়েটি বলল, 'স্বামীর চিকিৎসার জন্যে।'

'কেন, কি হয়েছে তার ?'

'ব্যাধি কি এক আধটা ? সে নানারকমেব ব্যাধি। কিন্তু বছর তিনেক ধরে সবচেয়ে বেশি ভুগছেন চোখ নিয়ে। চোখে দেখতে পান না। জ্বালা যন্ত্রণা। অনেক ধরা-পড়া করে ভর্তি করলাম হাসপাতালে। তারা মাসখানেক রেখেই ছেড়ে দিলে। বললে, সেরে গেছে। কিসের সেরে যাওয়া। বেরোতে না বেরোতে আবার যা তাই।'

'তারপর ?'

'তারপর দেখলাম বিনে পয়সায় কিছু হবে না। কিন্তু পয়সাই বা কোথায় পাব। গায়ে দু এক ভরি যা ছিল দিলাম। ঘরে এমন কোন জিনিস নেই যে পয়সা দিয়ে লোকে নেবে। তবু ওরই মধ্যে বেছে বেছে বাক্স বাসন-কোসন বেচে দিলাম। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা হল তা ডাক্তারে আর ওষুধে মাসখানেকের মধ্যেই শেষ। তারপর ফের যা তাই।'

বললাম, 'আপনার স্বামী চাকরিবাকরি কিছু করতেন না ?'

মেয়েটি বলল, 'সবই করেছেন। চাকরি করেছেন, ব্যবসা করেছেন, কিন্তু

কপালে কিছুই সয়নি। কারো কথা শোনেননি, কেবল নিজের গোঁ, নিজের খেয়াল মেনে চলেছেন। গোড়া থেকে যদি আমার বুদ্ধি নিতেন তাহলে কি এই দশা হত ?'

বললাম, 'এখন চলছে কি করে ?'

মেয়েটি বলল, 'আমি ওই কলোনিতে মেয়েদের স্কুলে একটু মাষ্টারির মত করি। তাতে দুজনের পেটের ভাতও হয় না দাদা, আর তো রোগের চিকিৎসা।'

বললাম, 'আপনাদের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ?'

মেয়েটি বলল, 'থাকবে না কেন, আছেন। আমার দুই দাদা আছেন, ওঁরাও তিন ভাই। সবাই আলাদা আলাদা। যার যার নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তবু আমার দাদারা গোড়ার দিকে খুব টেনেছেন। আর কত করবেন। যার যার চিন্তায় সেই অস্থির। উনি মানুষকে দোষ দেন, আমি কাউকে দোষ দিইনে দাদা। আমাব কপাল ছাড়া আর কারো কোন দোষ নেই।'

মেয়েটি গভীর অভিমানে চুপ করল।

আমি খুবই অভিভূত বোধ করলাম। একটু বাদে বললাম, 'আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন ?'

মেয়েটি এবার একটু খুশি হয়ে বলল, 'যা হয় কিছু সাহায্য করুন। ডাক্তার বলছে এবার একটা চশমা করিয়ে নিলে নাকি একটু একটু দেখতে পাবে। এই দেখুন ডাক্তার চশমার জন্যে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন। কিন্তু আজ মাসখানেকের মধ্যে চশমা কিনে দিতে পারলাম না। কুড়ি টাকার ধাক্কা। অত টাকা আমি কোথায় পাব।'

বললাম, 'কি রকমের চশমা। অত লাগবে কেন। কমেও হতে পারে। আমার জানাশোনা দোকান আছে, সস্তায় করিয়ে দেওয়া যাবে। আপনি যা পারেন সংগ্রহ করে এখানে আসবেন আর একদিন। আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

আমার কথার ভঙ্গীতে মেয়েটি হতাশ হল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'সংগ্রহ তো আমাকে আপনাদের দশজনের কাছ থেকেই চেয়ে চিন্তে করতে হবে দাদা। আপনি নিজে কিছু দেবেন না ?' .

লজ্জিত হয়ে বললাম, 'দেব বই কি, তবে আমার সাধ্য খুবই সামান্ত।'

ড্রয়ার খুলে দু টাকার একখানি নোট মেয়েটির দিকে এগিয়ে ধরলাম।

সে নোটখানা নিয়ে খুশি হয়ে বলল, 'নমস্কার দাদা। আপনার দয়ার কথা মনে থাকবে। এত দয়া অনেকেই করে না। কিছু দেওয়া তো ভালো এতক্ষণ ধরে পরের দুঃখের কথা শোনবার মানুষই বা সংসারে কোথায় বলুন।'

প্রেসক্রিপশনখানা সে আমার টেবিলের উপর থেকে কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল —আমি সেখানা তার হাত থেকে চেয়ে নিয়ে বললাম, 'দেখি, কি রকম চশমা, কত পাওয়ার লাগবে।'

মেয়েটি যেন অনিচ্ছার সঙ্গে আমার হাতে প্রেসক্রিপশনখানা এগিয়ে দিল।

হাসপাতালের সীল দেওয়া কোন এক মণিময় ভট্টাচার্যের প্রেসক্রিপশন। ডাক্তার সব সময়ের জন্যে তাকে চশমা ব্যবহার করতে বলেছেন বটে, কিন্তু এ ব্যবস্থাপত্র দু বছর আগের।

বললাম, 'এ তো দেখছি পুরনো প্রেসক্রিপশন। এতদিনের মধ্যে আপনি চশমা কিনে দিতে পারেন নি ?'

মেয়েটির মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, পারলাম আর কই। পারলে কি আর মানুষের দোরে দোরে—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু এই না আপনি বললেন মাত্র মাস খানেক ধরে চশমার চেষ্টা করছেন। আপনি না বললেন হাসপাতালের ডাক্তার ছাড়াও অন্য বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন। কই তাঁর প্রেসক্রিপশন।'

'সেগুলি বাসায় রয়ে গেছে। ভুলে আনিনি। পুরনোটা নিয়ে এসেছি।'

এতক্ষণের সেই সপ্রতিভতা মেয়েটির মধ্যে আর নেই। আসামী এবার হাতে হাতে ধরা পড়েছে।

আমি প্রেসক্রিপশনটা আরো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বললাম, 'তাছাড়া

আপনি যেসব শক্ত অসুখের কথা বলেছিলেন এ প্রেসক্রিপশনে তার কিছুই তো দেখছিনে। এতো সাধারণ মায়োপিয়া। সামান্য পাওয়ার। মাইনাস টু মাত্র।'

মেয়েটি বলল, 'তারপরে বেড়েছে। তারপরে অসুখ আরো বেড়ে গেছে।'

মেয়েটি বলল বটে, কিন্তু গলার সেই স্বাভাবিক স্বর আর নেই। বলার সেই স্বাভাবিক ভঙ্গীও আর নেই।

আমি তার দিকে তাকিয়ে এবার একটু হেসে বললাম 'বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা আসুন আপনি।'

এমনভাবে তাকালাম, এমনভাবে হাসলাম যে তার বুঝতে বাকি রইল না আমি তার কিছুই বিশ্বাস করিনি। তার স্বামীর চশমা মিথ্যে, চোখের অসুখ মিথ্যে, এমন কি স্বামী পযন্ত সত্যি নয়।

মেয়েটি কি যেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, এই সময় সেই 'বাণী সঙ্ঘ'এর ছেলের দল আবার এসে আমাব জানলার কাছে দাঁড়াল, 'দাদা আপনার চাঁদাটা এবার দিয়ে দিন।'

আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'যাও, যাও বলছি এখান থেকে।'

ওরা দু-তিন জনে প্রতিবাদ করে উঠল, 'বারে, আপনি তো আসতেই বললেন।'

'না বলিনি। সকাল থেকে কেবল চাঁদা। যথেষ্ট দিয়েছি। আর কাউকে এক পয়সা দেব না। যাও এখান থেকে।'

'না দেবেন না দিলেন। তা অত ধমকাচ্ছেন কেন।—সরস্বতী পূজোর চাঁদা দেবেন না, ভারি তো লেখক।'

আমি ফের তাড়া দিয়ে বললাম, 'ডেঁপো ছেলের দল, যাও বলছি।'

ছেলেরা সরে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখি খোলা দরজা দিয়ে মেয়েটিও সুড় সুড় করে পালিয়েছে।

ভাবলাম এই রকমই ওরা ঠকিয়ে বেড়ায়। কখনো মা সাজে, কখনো স্ত্রী সাজে। কখনো স্বামীপুত্রহীনা অনাথার বেশে আসে। এ ব্যবসার গল্প অনেক

শুনেছি। দল আছে, দলপতি আছে। তারাই এদের চালায়। ছুটো টাকা ভাহা ঠকিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু ছু মিনিট যেতে না যেতেই দেখি সেই বাণী সঙ্ঘের ছেলের দল আবার ফিরে এসেছে, 'ও মশাই শুনুন।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আবার এসেছ তোমরা?'

দলের মধ্যে যে সবচেয়ে মাথায় লম্বা তার বয়স তের-চৌদ্দ। সে এগিয়ে এসে এবার হেসে বলল, 'হ্যাঁ এসেছি। আপনার লেখার ডিস্টার্ব করেছি বলে আপনি চটে গিয়েছিলেন। আপনাকে কোনদিন এত চটতে দেখিনি। এই নিন আপনার রসিদ।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, রসিদ আবার কিসের?'

ছেলেটি হেসে বলল, 'ওই ভদ্রমহিলা দিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার নামে রসিদ কেটে দিতে। উনি বুঝি আপনার আত্মীয়া হন?'

ঢোক গিলে বললাম, 'হ্যাঁ।'

ছু টাকার রসিদখানা ছেলেটি আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'যাবেন কিন্তু আমাদের ক্লাবের পূজোয়! আপনারা না গেলে চলবে কি করে।'

বললাম, 'যাব।'

তারপর থেকে সেই নাম-না-জানা অপরিচিতা মেয়েটির কথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে। সে কতখানি মিথ্যে বলেছে আর আমিই বা কতখানি অপরাধ করেছি? ওই অবস্থায় ছুটি টাকা সে কি করে ফিরিয়ে দিতে পারল। দেওয়ার উদ্দেশ্যই বা কি। অনেক রকম জবাবই মনে পড়ে। কিন্তু আমরা কোন কোন প্রশ্নের অনেক জবাব তো চাইনে, মাত্র একটি স্পষ্ট জবাবই চাই। বড় বড় প্রশ্ন তো দূরের কথা, অনেক ছোট প্রশ্নেরও সে জবাব সব সময় মেলে না।

ছবি

পাবলিশারের দোকান থেকে তুজনে একসঙ্গেই বের হলাম। আমি আর আমার গল্প সঙ্কলনের প্রচ্ছদ শিল্পী মৃগাঙ্ক সোম। তুজনেই টাকার তাগিদে এসেছিলাম। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়নি। পাবলিশার দিন দশেক বাদে তুজনকেই ফের আসতে বলেছেন।

রাস্তায় নেমে মৃগাঙ্ককে বললাম, 'চল একটু চা খাই, অমন মুখ কালো করে থেকে আর লাভ কি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমি তো তোমার মুখই কালো দেখছি।'

বললাম, 'নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া করে লাভ নেই। তার চেয়ে মেনে নিচ্ছি তুজনের মুখের রংই এক রকম। একজনের মুখে আর একজনের প্রতিবিম্ব। এসো শুকনো গলাটা একটু ভিজিয়ে নেই। তারপর কার মুখ বেশি কালো তাই নিয়ে জোর ঝগড়া চালানো যাবে।' রাস্তার ওপারে একটি চায়ের দোকান দেখে আমি ওর হাত ধরে একবার টান দিলাম।

কিন্তু মৃগাঙ্ক আকৃষ্ট হোল না, বলল, 'তার চেয়ে চল একেবারে বাসায় গিয়েই চা খাব। তুমি তো আমাদের বাসায় যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ।'

বললাম, 'তুমিই যেন কত যাতায়াত রেখেছ। আচ্ছা চল, তোমার ষ্টুডিও দেখেই বিকালটা কাটাই।'

মৃগাঙ্ক একটু হাসল, 'কেবল ষ্টুডিও কেন, ষ্টুডিও, মডেল সবই দেখবে, চলো।'

মৃগাঙ্কের এই আমহার্ষ্ট রো-এর বাসায় এর আগে আমি আসিনি। একতলায় পাশাপাশি তুখানা ঘর। ছোট খানায় ওর রুগ্ন বুড়ো বাবা বিড়ি টানছেন। ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই নিকেলের চশমাটা কপালের ওপর তুলে বললেন 'কে?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমার বন্ধু কল্যাণ রায়। আপনি আগেও দেখেছেন ওকে।'

মৃগাঙ্কের বাবা নিস্পৃহভাবে বললেন, 'কি জানি, ঠিক মনে পড়ছে না। ইনিও কি তোমার মত ছবি আঁকেন নাকি?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'না।'

মৃগাঙ্কের বাবা খুশি হয়ে বললেন, 'কেন আঁকবে, ভদ্র লোকের ছেলে না? আমাদের গাঁয়ে পটুয়া কুমার আলাদা জাত ছিল। এসব তারাই করত। বামুন কায়েতরা এসব ছুঁতোও না। কিন্তু এখন তো আর জাত টাত কিছু নেই। সব জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্র। তুমি কি কর?'

মৃগাঙ্ক কি বলতে যাচ্ছিল, আমি ওকে বাধা দিয়ে চাকরি ক্ষেত্রের নামে নিজেকে পরিচিত করলাম।

মৃগাঙ্কের বাবা বললেন, 'এই দেখ, ঘর সংসার করতে হলে চাকরি বাকরি না করলে কি চলে? সে কথা সবাই বোঝে। কেবল আমার—। তারপর যে জন্যে বেরিয়েছিলি—আদায় টাদায় হোল?'

ছেলের দিকে তাকিয়ে মৃগাঙ্কের বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

মৃগাঙ্ক অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু হয়েছে।'

তারপর আমার দিকে ফিরল, 'এসো কল্যাণ। ওঘরে বসবে এসো।'

পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত বড। দেয়াল ঘেঁষা একখানা তক্তপোশ। লম্বা একখানা টুল জোড়া দিয়ে তার পরিসর বাড়ান হয়েছে। বিছানাটা গুটানো। জানলার ধারে একটা ইজেল। তাতে একখানা ছবির আভাস। তাকের ওপর কয়েকটা তুলি আর রঙের বাটি। নিচে একটা র‍্যাক। বই পত্রের সংখ্যা খুব বেশি নয়। একটা তাকে ছেলেদের বইখাতা আর খেলনাও স্থান পেয়েছে।

মৃগাঙ্ক একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বোসো। এই হোল ষ্টুডিও। আর মডেল বোধ হয় কলতলায় জল ভরছে। খবর দিচ্ছি।'

একটু বাদেই মৃগাঙ্কের স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন। সাতাশ আটাশ বছরের সাধারণ দর্শনা একটি বধূ। একটু শ্রান্ত আর রোগাটে। পায়ের কাছে আটপৌরে শাড়ির খানিকটা জায়গা ভিজে গেছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'কল্যাণ এতদিন বাদে আমার ষ্টুডিও আর মডেল দেখতে এসেছে রেবা। এতক্ষণ ধরে ষ্টুডিও দেখাচ্ছিলাম এবার—'

মৃগাঙ্কের স্ত্রী একটু ধমকের সুরে বললেন, 'আঃ থাম তো, সত্যি অনেকদিন আসেন না কল্যাণবাবু। এপথ একেবারে ভুলেই গেছেন।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আজও যে মনে পড়েছিল তা নয়। আমি চায়ের লোভ দেখিয়ে ওকে টেনে এনেছি। একটু চা কর, মঞ্জু কোথায়? মঞ্জু?'

'গলিতে খেলছে, ডেকে আনছি।'

মৃগাঙ্কের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ যাবার পর মৃগাঙ্ক নৈরাশ্যের সুরে বলল, 'সত্যি, মাঝে মাঝে ভাবি এবার একটা চাকরিই নেই। কোন কাগজের অফিসে কি সিনেমা কোম্পানীতে, কিন্তু দেবে কে? তাছাড়া এতদিন আলগা থেকে থেকে কোন বাঁধা কাজে ঢুকতে ভয়ও হয়। অমনিতেই তো বাঁধনের শেষ নেই।'

বললাম, 'চাকরি তোমার পোষাবে না। কেন, যুদ্ধের সময় থেকে তোমাদের আর্টিস্টদের অবস্থা তো ভালোই, বিশেষ করে যারা কমার্শিয়াল লাইনে আছ।'

মৃগাঙ্ক একটু হাসল, 'বাইরে থেকে ওইরকমই মনে হয়, আমরাও ভাবি তোমাদের লেখকদের অবস্থা আগেব চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে, কিন্তু—। তা ছাড়া কমার্শিয়াল লাইনেও যদি ষ্টিক করে থাকতে পারতাম তাহলেও কথা ছিল। কিন্তু তাও তো নয়, আমি সব সময়েই লাইনচ্যুত। যাকে বলে ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ।'

এ খবর আমি জানতাম। মৃগাঙ্ক ফাইন আর্টস নিয়েই পাশ করেছিল। কিন্তু বন্ধু মহলে চারু-শিল্পী হিসেবে ওর খ্যাতি থাকলেও অর্থাগম কিছুই হোল না। সংসারের চাপে মৃগাঙ্ক তখন কমার্শিয়ালের দিকে ঝুঁকল। কিন্তু সেখানেও ওর নিষ্ঠার অভাব দেখা গেলো। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না, বার বার চুক্তি ভঙ্গ করে, ব্যবসায়ের দিক থেকে ওর বদনামই হতে লাগল। এরই মধ্যে দুএকখানা ছবি আবার নামও করল। প্রদর্শনীতে পুরস্কৃতও হোল।

তারপর ক্ষের সংসারের চাপ। তেলের বিজ্ঞাপনে কেশবতীর লাবণ্য, কিংবা ডিটেকটিভ কাহিনীর গোয়েন্দা আর দুর্বৃত্তের পিস্তল যুদ্ধের দৃশ্যপট। সেই দোটানার টান মৃগাঙ্কের জীবনে এখনও সমানে চলেছে।

ঘরের শূন্য দেওয়ালগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি মৃগাঙ্কের দিকে তাকালাম—'তুমি যখন অখিল মিস্ত্রী লেনে ছিলে, কিছু কিছু পেইন্টিং এর কালেকশন দেখেছিলাম তোমার। সেগুলি কি হোল?'

মৃগাঙ্ক একটু হাসল, 'জানো না বুঝি, বাবার সঙ্গে সেবার রাগারাগি করে সব বিক্রি করে দিয়েছি। নিজের ছবি ঘরে রাখব, পরের ছবি-ও ঘরে রাখব, এত জায়গা কোথায়? বড় টানাটানি যাচ্ছিল, ধারে দেনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আপদ চুকিয়ে দিয়েছি।'

ছাত্র বয়স থেকে দেশী বিদেশী প্রিয় আর্টিস্টদের অনেক ছবি এবং আর্ট সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বই-ই মৃগাঙ্ক সংগ্রহ করেছিল। তার প্রায় কোন চিহ্নই নেই।

মৃগাঙ্ক বলল, 'আজ মনে হয় পথ ভুল করেছি ভাই, এ-পথে পা বাড়াবার আমার অধিকার ছিল না।'

বললাম, 'কী যে বল।'

'বাবা এসেছ, কী এনেছ আমার জন্যে?'

ছুটতে ছুটতে ছ-সাত বছরের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। রঙটা বাপের মতই কালো কিন্তু মুখের আদল মায়ের মত। বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, মুখের গড়নটাও একটু লম্বাটে ঢঙের। বেশ মিষ্টি চেহারা।

'কী এনেছ বাবা, কী এনেছ আমার জন্যে?'

'বল তো কী?'

পকেট হাতড়ে ছোট্ট সুন্দর একটা রঙের বাক্স বার করল মৃগাঙ্ক, 'এই নাও।'

বাপ আর মেয়ে দুজনের মুখেই আনন্দের ছাপ পড়েছে। এতক্ষণের নৈরাশ্য, পথ ভোলার দুঃখের কোন চিহ্নই নেই।

মঞ্জু বলল, 'ইনি তো কাকাবাবু, না বাবা ?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'নিশ্চয়ই, দেখতে জ্যাঠাবাবুর মত হলেও বয়সে কাকা।'

মঞ্জু বলল, 'ওঁকে আমার ছবি দেখাব ?'

'দেখাবে বই কি।'

ছুটে গিয়ে র্যাক থেকে একটা খাতা নিয়ে এল মঞ্জু। তারপর পাতা উল্‌টিয়ে উল্‌টিয়ে তার আঁকা ছবি দেখাতে লাগল। লাল নীল পেনসিলে আঁকা বিড়াল, নিচে লেখা 'আমাদের পুষি', একটা পাখী, আর একজন লোক, তার নিচে লেখা 'আমাব বাবা'।

মৃগাঙ্ক বলল, 'তোমার বাবা কি দেখতে অতই খাবাপ মঞ্জু ? তাকে কি বাইবে থেকেও মানুষের মত দেখায় না ?'

মৃগাঙ্কেব স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন, মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'ছবি দেখানো হচ্ছে বুঝি। যিনি আসবেন তাকেই বুঝি তোমাব ছবি দেখাবে ?' মঞ্জু বলল, 'দেখাবই তো, বাবা বুঝি দেখায় না ? আগে আগে তুমি বুঝি দেখাতে না ?'

মঞ্জুব মা প্রতিবাদ কবে বললেন, 'কি মিথ্যুক। আমি আবাব কবে ছবি আঁকলুম, দেখালুমই বা কাকে ?'

মঞ্জু বলল, 'কাকে আবাব, বাবাকে দেখাতে। বাবা তোমাকে ছবি আঁকা শেখাত না ? আমার সব মনে আছে।'

একটু যেন বিব্রত বোধ করলেন রেবা দেবী, বললেন, 'হয়েছে হয়েছে। তোমার তো কত কি-ই মনে থাকে। এখন চল তো ও ঘরে। কাকাবাবুর জন্য চা করবে, এসো।'

বললুম, 'চা দিয়ে চাপা দিতে পারবেন না কথাটা। এর আগে মঞ্জুর মত আপনারও ছবি আঁকবার শখ ছিল বলে আমার মনে পড়ছে। অখিল মিস্ত্রী লেনের বাসায় আপনার দুএকখানা আঁকা ছবি দেখেওছি। সেগুলি কি হোল। ছবি আঁকা ছাড়লেনই বা কেন।'

মৃগাঙ্ক চুপ করে বইল।

ওর স্ত্রী একটু হাসলেন, 'আপনিও যেমন। ছবি আঁকা ধরেছিলাম নাকি কোন দিন যে ছাড়ব? তাছাড়া মঞ্জুর মত শখ মঞ্জুর বয়সেই মানায়। আমাদের এ বয়সে সাজে নাকি? সবাই মিলে আর্টিস্ট হলেই হয়েছিল আর কি, সংসার ধর্ম সব শিকেয় তোলা থাকত।'

বললাম, 'কেন আর্টিস্টদের বুঝি সংসার ধর্ম নেই?'

যেতে যেতে রেবা দেবী একটু ফিরে তাকালেন, 'আছে নাকি? তা আপনারাই ভালো জানেন। মঞ্জু শুনে যাও তো।'

ছবি আঁকবার খাতা ফেলে রেখে মঞ্জু মায়ের পিছনে পিছনে ছুটল। একটু বাদে কেবল মঞ্জু নয়, মঞ্জুর বাবারও ডাক পড়ল।

দেয়ালের আড়াল থেকে একটুকবো দাম্পত্যালাপ কানে এল। অনিচ্ছা সত্বেও তা শুনতে হোল আমাকে।

'কটাকা পেলে?'

'কিছুই পাইনি।'

'তবে মঞ্জুর জন্যে রঙের বাক্স আনলে কি দিয়ে?'

'পকেটে আগে যা ছিল তাই দিয়েই কিনেছিলাম। মেয়েটা কতদিন ধরে আবদার করছে। ভেবেছিলাম, টাকাটা আজ পাবো। ধরা বাঁধা কথা—।'

'এদিকে বাবাকে তো বলে দিয়েছি টাকা আদায় হয়েছে। খানিক বাদে উনি যখন আফিং-এর জন্যে টাকা চাইবেন, কি করে সামলাব?'

একটুকাল আর কোন কথা শোনা গেল না। তারপর আবার একটু সংলাপ।

'ওঁকে চা দেব কি দিয়ে?'

'শুধু চা দিলেই হবে, ও তো আর নতুন আসেনি।'

'নতুন আর কে আসে। তুমিই কেবল চির নতুন।' মৃগাঙ্কের স্ত্রী ফের ঘরে ঢুকলেন। তাকের ওপর থেকে একটা কৌটো নামিয়ে কয়েক আনা খুচরো পয়সা বের করে নিয়ে গম্ভীর মুখে আবার চলে গেলেন। বাধা দেওয়াটা অশোভন ভেবে আমি বলতে গিয়েও কিছু আর বললাম না।

একটু [illegible] চুপচাপ কাটবার পর মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, কি যেন কথা হচ্ছিল [illegible]

বললাম, 'আর্টিস্টদের সংসার ধর্মের কথা।'

মৃগাঙ্ক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'সংসার ধর্ম। সংসার আর ধর্ম, দুটোকে একসঙ্গে মিশিয়ে বলছ কেন? আর্টিস্টরা যখন সংসাব করে তখন ধর্ম রাখতে পারে না, আবার যখন ধর্ম বাখতে যায় তখন সংসাব রক্ষা হয় না।'

বললাম, 'তার মানে?'

'মানে বলতে গেলে একটি গল্প বলতে হয়। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস নেই, সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেটাকে টুকে নেবে।'

বললাম, 'খেপেছ। সব টুকে নেওয়া গল্পই কি লেখা যায়, আব যদি লিখিও তোমাকে দিয়ে illustration করাব।'

মৃগাঙ্ক একটু হাসল, 'তাহলে তো বলতেই হয়।'

তারপব ফেব একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'জানো বোধ হয়, মঞ্জুর মত রেবাকেও ছবি আঁকা শেখাবার আমার শখ ছিল। ও শুধু আমার ছবির মডেল হয়ে থাকবে না, নিজেও একটু আধটু আঁকতে শিখবে, ছবি বুঝতে শিখবে—এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা। কিন্তু ইচ্ছাকে কাজে রূপ দিতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকাব তা আমার মধ্যে নেই। আর যাই হোক গুরুগিরি করা আমার পোষায় না। রেবা নিজের খেয়াল খুশি মত কখনো শুরু করে, কখনও ছাড়ে। আমাকে কিছুতেই দেখায় না। বলে, তুমি হাসবে। তবু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওর ছবি দুএকবার না দেখেছি তা নয়। মাঝে মাঝে এক আধটু উপদেশ নির্দেশও দিয়েছি। আর প্রায়ই বলেছি, তোমাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেব। অবস্থাটা একটু ফিরলেই হয়। কিন্তু অবস্থা আব ফিরল না, দশ বছব পরে দুরবস্থা আবো জোরালো হয়ে উঠল। তার অনেক আগেই মা মারা গেছেন, বাবা অকর্মণ্য হয়ে ঘরে এসে বসেছেন। সমস্ত সংসাবের দায়িত্ব পড়েছে রেবাব ওপর। একহাতে সবদিক সামলাতে হয়। দুরন্ত মেয়েকে সামাল দেওয়া সবচেয়ে শক্ত। ওর ছবি আঁকবার উৎসাহ ঘুচে গেল। আমিও আর সে কথা তুলবার ফুরসত

পেলাম না। কিন্তু একবার বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একখানা ছবি আমাকে নিজেই দেখাল রেবা। ছবিখানার নাম হরগৌরী। ছবিটা আমাদের আগের বাসায় দিন কয়েক টাঙান ছিল বোধহয় দেখে থাকবে। আমার রঙের সঙ্গে যদিও মহেশ্বরের মিল নেই, তবুও আমার মুখের খানিকটা আদল রেবার হর হরণ করেছিল। আর গৌরী যদিও আদর্শ সুন্দরী তবু তার সঙ্গে আমার ঘরণীর এক আধটু সাদৃশ্য যে না ছিল তা নয়। শিল্পী যে শুধু আমার গৃহিনী নয়, কলাশিষ্যাও, ছবিখানাতে তার নিদর্শন দেখে আমি মনে মনে আত্মপ্রসাদ বোধ করে রেবাকে বললাম, এখানা কোন exhibition-এ পাঠাই, না হয় কোন কাগজে ছাপিয়ে দিই। কিন্তু রেবা কিছুতেই রাজী হোল না। ট্রাঙ্কে বন্ধ করে রাখতে রাখতে বলল, 'দূর, এ আবাব একটা ছবি হয়েছে নাকি। এ নিয়ে হৈ চৈ করলে লোকে তোমাকে স্ত্রৈণ বলে গাল দেবে।'

বললাম, 'দিক না। আমার স্ত্রৈণ রব উঠলে তোমার তো গৌরব।'

রেবা বলল, 'আমি সে ধরনের স্ত্রী নই।'

তারপর বছর দেড়েক আগের কথা। তখনও অখিল মিস্ত্রি লেনেই আছি। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষা যেন আর হয় না এমনই অবস্থা। বহুদিন কাজকর্ম নেই। দিন দিন দেনার দায়ে ডুবছি—বাড়িওয়ালা থেকে শুরু করে বন্ধু-স্বজন সবাই মহাজন। এর মধ্যে মণ্টু পড়ল টাইফয়েডে। নিজেব ছবি বলতে ঘরে কিছু ছিল না। নাম মাত্র দামে সবই বিক্রি করে দিয়েছিলাম। এবার কালেকশন গুলি বেচতে শুরু করলাম। বইপত্র যা ছিল ওজন দরে দিলাম ছেড়ে। রেবা গোড়ায় বাধা দিয়েছিল, এবার আশ্বাস দিল, 'তুমি তুলি ধর ফের, আমাদের সব হবে।'

কিন্তু শুধু তুলি ধরলেই কি আর কাগজে রঙ ধরে। মাস খানেক চেষ্টা করেও একখানা ছবি আঁকতে পারলাম না। কিছুতেই নিজের পছন্দ হয় না, কাজ এগোয় না। এবার রেবার বিশ্বাসও টলে উঠল। ট্রাঙ্ক থেকে সেই হরগৌরী ছবিখানা বের করে দিয়ে বলল, 'দেখতো কেউ নেয় নাকি।'

আমার নিজের ছবির যে দুএকজন গ্রাহক আছে তাদের কাছে গিয়ে ধন্না

দিলাম। তাঁরা হেসে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর হাতের কাজ। শখের জিনিস। টাকায় এর দাম হয় না। আপনার ছবি আনুন।'

ছবিখানি ফেরত এনে রেবার হাতে দিয়ে বললাম, 'তুলে রাখ।'

রেবা আমার দিকে তাকাল, 'বিক্রি হোল না?'

আমতা আমতা করে বললাম, 'উপযুক্ত দাম না পেলে—'

রেবা বলল, 'থাক। তোমার নতুন একটা গুণ বেড়েছে, দিব্যি মিথ্যে কথা বলবার শক্তি হয়েছে আজকাল।'

মূল্যহীন তুচ্ছ ছবিখানা আর ট্রাঙ্কে তুলল না রেবা। আমার ষ্টুডিও-রূপী এই তক্তপোশের ওপরই ফেলে রাখল।

তিন চার দিন ধরে দিন নেই, রাত নেই একখানা ছবি আঁকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তুলি আমার বশে এল না। এদিকে রোগা মেয়ের পথ্য জোটে না। বাবার গালাগালে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে। রেবা তার শেষ সম্বল হার ছড়া আমার হাতে তুলে দিলে।

বললাম, 'কিন্তু—'

রেবা বলল, 'এর মধ্যে আমি বলবার কিছু নেই। যদি সময় আসে তখন সব আবার হবে। তুমি আর দেরি কোরো না।'

স্যাণ্ডাল পায়ে কেবল রাস্তায় নেমেছি, একখানা ট্যাক্সি এসে বাড়ির সামনে থামল, আর তার ভিতর থেকে বেরুলেন আমার ছবির একান্ত অনুরাগী প্রভাস দত্ত আর তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি।

প্রভাস দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে কাজ করে। মাইনে বেশ মোটা। বেনামীতে কি সব ব্যবসা-ট্যাবসাও আছে। ছাত্র বয়স থেকেই ও আমার ছবির ভক্ত।

প্রভাস বলল, 'দিন কয়েকের ছুটিতে এসেছিলাম। আজই ফিরছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরতে মন চাইছিল না, তারপর ব্যাপার কি। ছবি টবি আঁকা ছেড়ে দিলে নাকি?'

বললাম, 'প্রায় ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেই।'

অঞ্জলি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'অমন কাজও করবেন না। আপনার কথা দিল্লীতে আমি অনেককে বলেছি। 'আচ্ছা, ওখানে ওঁর ছবিগুলির একটা exhibition-এর ব্যবস্থা করা যায় না?'

সুদর্শনা সালঙ্কারা তরুণী বান্ধবীর মুখে আন্তরিক শিল্পপ্রীতি ফুটে উঠল।

প্রভাস বলল, 'চল, নতুন কি আঁকছ টাকছ দেখি।'

বললাম, 'কিছু আঁকছিনে।'

প্রভাস বলল, 'তুমি তো চিরকালই নেতিবাদী, তোমার ঘর খানাতল্লাশ না করা পর্যন্ত আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

জোর করেই ওরা আমার ঘরে ঢুকল। রেবার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

অঞ্জলি বলল, 'এবার কিন্তু আপনার একটা ষ্টুডিও করে নেওয়া উচিত।'

প্রভাস বলল, 'আর্টিস্টের পরিচয় ষ্টুডিওর মধ্যে নয়, ছবিব মধ্যে। বাঃ, এই যে, তবে যে বলেছিলে ছবি টবি কিছু নেই। আর্টিস্ট হলেই কি মিথ্যেবাদী হতে হবে?'

হরগৌরী ছবিখানা প্রভাস হাতে তুলেই অবস্থা।

অঞ্জলি বলল, 'মিথ্যেকে সত্য করে তোলাই তো ওঁদের কাজ। দেখি দেখি, বাঃ।'

প্রভাস বলল, 'চমৎকার, নয়?'

অঞ্জলি বলল, 'নিশ্চয়ই, এত ভালো ছবি শিগগির আমি দেখিনি।'

প্রভাস বলল, 'ওর সেই গোড়ার দিকের বলিষ্ঠতা এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এখানা আমি নিচ্ছি মৃগাঙ্ক।' আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, অঞ্জলি বাধা দিয়ে বলল, 'উঁহু, আপনার কোন আপত্তিই শুনব না। তাছাড়া একটা কথা শুনলে আপনি আপত্তিও আর করবেন না। বলব?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি মৃদু হাসল।

প্রভাস বলল, 'বল না।'

'উঁহু, তুমিই বল।'

প্রভাস একটু হেসে বলল, 'আজ আমাদের marriage anniversary.'

অঞ্জলি আমার দিকে তাকাল, 'কিন্তু মিঃ সোম, ছবিতে শিল্পীর নাম নেই যে!'

আমি মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে রইলাম। কথা গুছিয়ে নিয়ে যখন বলতে যাচ্ছি, রেবা তার আগেই বলে উঠল, 'উনি অমনি করছেন আজকাল। নাম দিতে চাইছেন না। বলছেন ওঁর পরিচয় তো ওঁর ছবির মধ্যেই আছে।'

প্রভাস মুরুব্বির ভঙ্গীতে বলল, 'ও চিরকাল shy, আর সেইজন্যেই ওর কিছু হোল না।'

অঞ্জলি বলল, 'তবু নামটা থাকা ভালো। বন্ধুদের তাতে তৃপ্তি হয়। তুলি দিয়ে কোন রকমে আপনার নামের ইনিসিয়ালটা একটু দিয়ে দিন মিঃ সোম।'

রেবা বলল, 'দাও না, উনি যখন অত করে বলছেন।'

তুলি দিয়ে 'গৌরীর' পায়ের নিচে নিজের নাম স্বাক্ষর করলাম।

চেকবুকে প্রভাসের নাম স্বাক্ষরিতই ছিল। তারিখ, আমার নাম আর দুশো টাকার একটি অঙ্ক শুধু ওকে বসাতে হোল।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, 'সত্যি এমন যে হবে'—

রেবা বাধা দিয়ে বলল, 'চেকটা আগে ভাঙিয়ে আনো।' বেরুবার আগে হার ছড়া ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'যাক, এবারকার মত তোমার এটা তো রক্ষা পেল।' রেবা আমার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, সেই তো সান্ত্বনা।'

চেক ভাঙিয়ে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বাসায় ফিরলাম। রোগা মেয়ের শিয়রে বেদানার ঠোঙাটা রাখতে গিয়ে দেখি কয়েকটা তুলি আর রঙের বাক্স নিয়ে মঞ্জু শুয়ে শুয়ে খেলছে। বললাম, 'ওগুলি পেলি কোথায় রে।'

'মা দিয়েছে বাবা। ভালো হয়ে ছবি আঁকব।' তারপর থেকে মঞ্জুই ছবি এঁকে চলেছে, রেবা আর তুলি ধরেনি।'

মৃগাঙ্ক থামল।

চা আর জলখাবারের প্লেট হাতে মৃগাঙ্কের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন।

ঘড়ি

অফিসে বেরোবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে গেল অসিতের। বলবার মধ্যে মেয়েকে কেবল বলেছে, 'মিণ্টু, অনুদের বাড়ি থেকে দেখে আয় তো কটা বাজল।'

সুপ্রীতি অমনি বলে উঠল, 'না, পারবে না যেতে, সময় নেই অসময় নেই দিনের মধ্যে পনের বার পরের বাড়িতে ঘড়ি দেখতে পাঠানো। লোককে বিরক্ত করে মারা। নিজেদের ঘড়িটা কি আর আনতে হবে না?'

অসিত বলল, 'সরোজ নিজেও তো ঘড়িটা দিয়ে যেতে পারত। তাকে তুমিই তো ডেকে সারাতে দিয়েছ ঘড়ি।'

সুপ্রীতি বলল, 'সারাতে দিয়েছি বলেতো আর দান করে দিইনি। তাঁর যদি দিয়ে যাওয়ার সময় না হয়, তুমি নিজেই না হয় গিয়ে নিয়ে আসতে, তাতেই বা কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত।'

অসিত বলল, 'দেখ, দিন রাত কটকট করো না। আমার ঘড়ি আমি যেদিন পারি আনব, তা নিয়ে তোমারই বা অত মাথা ব্যথা কিসের।'

সুপ্রীতি শ্লেষ করে বলল, 'তাতো ঠিকই, তবু যদি নিজের রোজগারের টাকায় কেনা হোত জিনিসটা, সংসারে নিজের পয়সায় কোন জিনিসটাই বা তুমি এই সাত বছরের মধ্যে করতে পেরেছ? তা যদি করতে, তাহলে আলাদা দরদ থাকত। চোখের উপর জিনিসগুলি এমন করে নষ্ট হয়ে যেতো না।'

'নেওয়ার সময় তো গরীব মানুষের ঘাড়ে চাড়া দিয়ে আদায় করে নিয়েছ। এখন আর কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই, থাকে লক্ষ্মী, যায় বালাই।' এমন খোটা সুপ্রীতি প্রায়ই দেয়। সংসারের সব আসবাবই সে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। অসিত নিজের হাতে কিছুই করেনি।

'বেশ তা যদি মনে করো তাহলে তাই।' বলে অসিত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। অফিসের বেলা হয়ে গেছে। অন্যদিন দুজনের মেজাজ যখন ভালো থাকে এমন ঝগড়া করতে করতে বেরোয় না অসিত। ধীরে সুস্থে খেয়ে উঠে, তক্তপোশের এককোণে পা ঝুলিয়ে বসে, স্ত্রীর হাতের পানটি চিবুতে চিবুতে অসিত হেসে হেসে স্ত্রীকে দু-একটা সোহাগ আর ঠাট্টা তামাসার কথা বলে। তারপর সারাদিনের মত বিদায় নেয়।

কিন্তু আজকের দিনটা একেবারে অন্যমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে।

মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল অসিতের। ষষ্ঠীতলার মোড়ে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বাসটা ছেড়ে দিল। অসিত হাত বাড়িয়েও গাড়িটাকে এক সেকেণ্ডের জন্য থামাতে পারল না।

আজ নির্ঘাত লেট হবে। এ্যাটেনড্যানস নিয়ে নতুন ম্যানেজার বড় বেশি কড়াকড়ি শুরু করেছে। নিশ্চয়ই কথা শুনতে হবে তাঁর কাছে। খানিকটা আশঙ্কা খানিকটা বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল অসিতের। ঘড়িটা কাছে থাকলে আর এত অসুবিধে হয় না। ঠিক সময় মত বেরোন যায়। সুপ্রীতি সত্যি বলেছে। ঘড়িটা আনিয়ে নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সরোজই বা কি ধরনের মানুষ! ঘড়িটা ও নিজেই গরজ করে নিয়ে গেল, আর দেওয়ার সময় দিয়ে যেতে পারে না। দায়িত্ব বলে কোন বস্তু যদি থাকে সরোজের।

লোকটি চিরকালই ওই রকম। পুরনো বন্ধুর উপর ভারি রাগ হলো অসিতের।

রাগের মাত্রাটা বেড়ে গেল অফিসে লেট হয়ে। দ্বিতীয় বাসটাও যাত্রী বোঝাই হয়ে এসেছে, তবু অনেক কষ্টে তার হাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে অসিত অফিসে পৌঁছল। দেয়াল ঘড়িতে দশটা পনের। হাজিরা খাতা চলে গেছে ম্যানেজারের ঘরে। কাটা দরজা ঠেলে ঘাড় নিচু করে সেখানে ঢুকতেই ম্যানেজার বললেন, 'কি ব্যাপার মিঃ ব্যানার্জী?'

অসিত বলল, 'স্যার, ঘড়িটা কাছে না থাকায় বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।'

ম্যানেজার বললেন, 'কেন, কি হয়েছে আপনার ঘড়ির।'

অসিত বলল, 'এক বন্ধুকে সারাতে দিয়েছিলাম, এখনো ফেরত পাইনি।'

ম্যানেজার বললেন, 'দেখুন, একেবারে খাস সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন কিনা তিনি। আর এমন দেরি করবেন না।' বলে ম্যানেজার সামনের ফাইলটায় মন দিলেন।

অসিতের পক্ষে এইটুকু তিরস্কারই যথেষ্ট, সীটে এসে গম্ভীর মুখে বসল অসিত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘড়িটার কথাই তার মনে পড়তে লাগল। বড় দায়িত্বহীন লোক এই সরোজ। ওকে নিয়ে আর পারবার জো নেই। মাস দুই হয়ে গেল, এরমধ্যে সে ঘড়িটা ফেবত দিয়ে যেতে পারল না।

অবশ্য নেওয়ার সময় কেবল সরোজই গরজ করে নেয়নি, সুপ্রীতিও গরজ করেই দিয়েছিল। চলতে চলতে একদিন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ঝাঁকুনি দিয়েও তাকে না চালাতে পেরে নিঃশব্দে দেরাজটার মধ্যে চালান করে দিল অসিত।

সেই থেকে সুপ্রীতি প্রায় রোজ তাগিদ দেয়, 'ঘড়িটা দেরাজের মধ্যে পড়ে থাকবে নাকি, সারিযে আন।'

অসিত বলে, 'আনব।'

সুপ্রীতি বলে, 'তুমি আব এনেছ।'

এসব ব্যাপাবে স্বামীর ওপব তেমন ভরসা নেই সুপ্রীতির। কেনাকাটা, সারানো, মেরামতের ব্যাপারে অসিত বড কুঁড়ে। অনেক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তবে তাকে দিয়ে কাজ কবান যায়। হারমোনিয়ামটা তিনমাস ধরে ভেঙে পড়ে ছিল ঘরে, অসিতকে দিয়ে সুপ্রীতি কিছুতেই সেটা সারিয়ে আনতে পারেনি। শরণ নিয়েছে ওর বন্ধু সরোজের, চায়ের কাপ সামনে ধরে দিয়ে হেসে বলেছে, 'সরোজবাবু, আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। আপনার বন্ধুকে দিয়ে তো কিছুতেই হোল না।'

বলে বিকল হারমোনিয়ামটির একটা গতি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। এসব ব্যাপারে সরোজ একপায়ে খাড়া। সেইদিনই রিক্সা করে নিয়ে গেছে হারমোনিয়াম। সারিয়ে এনে দিয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে।

সুপ্রীতি স্বামীকে বলে, 'ভারি করিতকর্মা পুরুষ। অনেক গুণ আছে সরোজবাবুর।'

অসিত হেসে জবাব দেয়, 'কেবল গুণ কেন রূপই বা কম কিসের? আসল পক্ষপাতটা সেইজন্যেই।'

সরোজ অসিতেরই সমবয়সী, দুজনেরই বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের মধ্যে। কিন্তু বয়েসের মিল থাকলে কি হবে, অসিতের সঙ্গে আকৃতি প্রকৃতির তেমন মিল নেই সরোজের। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন, গায়ের রং ফরসা। চওড়া কপাল, টানা টানা নাক চোখ, ওর সঙ্গে তুলনা করলে কালো আর খানিকটা বেঁটে অসিতকে কুরূপই বলতে হয়। তাই সরোজের ওপর পক্ষপাতের কথা তুলে স্ত্রীকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে অসিত। প্রকৃতির দিক থেকেও সরোজ একটু আলাদা। ভারি স্ফূর্তিবাজ, চালাক চতুর চটপটে।

অসিতের মত এমন মুখ গম্ভীর করে থাকবার লোক সে নয়। তাই স্বামীর এই বন্ধুটিকে ভারি পছন্দ করে সুপ্রীতি। খাটাতে ভালোবাসে, ফরমায়েস করে, নানা রকম কাজকর্ম করিয়ে নেয়।

সরোজ সেদিন বেড়াতে এলে দেরাজ থেকে সুপ্রীতিই ঘড়িটা বের করে সেদিন তার হাতে তুলে দিয়েছিল, 'দেখুন দেখি কি হোল ঘড়িটার।'

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল সরোজ, 'কি হয়েছে তোমার ঘড়ির?'

অসিত বলেছিল, 'হবে আবার কি, মাঝে মাঝে চলে, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়।' সরোজ একটু হেসে বলে ছিল, 'ঠিক একেবারে আমার সংসারের মত।'

বন্ধুর হাসির ধরন দেখে দুঃখ হয়েছিল অসিতের। সরোজের অবস্থা ভালো নয়। একটা স্টেশনারি ষ্টোর্সে সেলসম্যানের কাজ করত। মাইনে আর ভাতা বাড়াবার দাবীতে একবার জোট পাকিয়েছিল মালিকের বিরুদ্ধে, মালিক সহ্য করেননি। মাস কয়েকের মধ্যে বেশির ভাগ কর্মচারীকে ছাঁটাই করে গোটা দল শুদ্ধই বদলে ফেলেছেন। সরোজের চাকরি গিয়েছিল প্রথম দফায়। তারপর থেকে সে আর চাকরিতে ঢোকেনি। বলেছে, ব্যবসা করব। বাণিজ্যে

বলতে লক্ষ্মী। কিন্তু প্রবচনটা সরোজের বেলায় মোটেই ফলে উঠল না। লক্ষ্মী তার ঘরে ঢোকাতো দূরের কথা, দোরও মাড়ালেন না। অল্প স্বল্প পুঁজি পাটা যা ছিল বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নিঃশেষ হোল। সরোজ এখন দশকর্মা।

বাঁধাধরা কাজকর্ম কিছু নেই। যা পায় তাই করে, অনেক সময় কিছু না করেও থাকতে হয়।

বন্ধুর খেদোক্তি শুনে সহানুভূতির সুরে অসিত বলেছিল, 'তোমাকে বললাম একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করতে—।'

সরোজ তেমনি হেসে বলেছিল, 'ক্ষেপেছ, এতদিন ছাড়া থেকে থেকে আর কি গোয়ালে ঢুকতে মন যায়।'

তারপর রিস্টওয়াচটার ডালাখুলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকব্জাগুলির পরীক্ষায় মন দিয়েছিল সরোজ। একটু পরে মুখ তুলে বলেছিল, 'না ভাই, আমার বিদ্যেয় কুলোবে না, মনে হয় হেয়ার স্প্রিংটাই জখম হয়েছে।'

অসিত বলেছিল, 'তা হতে পারে, মাঝে মাঝে আমার মেয়েও ঘড়িতে দম দেয় কিনা, ঘড়ির ওপর ওর ভারি লোভ।'

ছ বছরের মিণ্টু, শান্ত মেয়ের মত বাপের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বাপের ব্যঙ্গোক্তি বুঝতে তার দেরি হোল না। সে ছুটে মার আড়ালে গিয়ে লুকোল।

সুপ্রীতি মেয়ের বব করা চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে বলল, 'বাঃ, কেবল মেয়ের দোষ দিলে কি হবে, ওঁর নিজেরই যেন যত্ন আছে জিনিসপত্তরের ওপর, সময়মত চাবিও তো পড়েনা সবদিন; নষ্ট হবে না ঘড়ি? কদিন ধরে বলছি ঘড়িটা সারিয়ে আন, তা কানেও তুলছেন না।'

অসিত বলল, 'সাধে কি আর তুলিনে, পকেটের কথা ভেবেই কালা হয়ে থাকতে হয়, বুঝলে সরোজ? এই গত বছরেও তো দশটাকা দিয়ে অয়েল করিয়েছি। এতদিন গরীবের ঘোড়ারোগের কথা শুনে এসেছি। ঘড়ি-রোগটাও গরীবের পক্ষে কম মারাত্মক নয়, ভাই। শ্বশুরমশাই তো দিয়েই খালাস, এখন এই হাতী পোষে কে?' বলে স্ত্রীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে

মুখটিপে একটু হেসেছিল অসিত। সুপ্রীতি দেখতে একটু পুষ্টাঙ্গী, কিন্তু ফরসা রঙের সঙ্গে তা বেশ মানিয়ে গেছে। মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায় সুপ্রীতিকে।

সরোজের দিকে চেয়ে সুপ্রীতি মুখভার করে বলেছিল, 'শুনলেন আপনার বন্ধুর কথা ?'

সরোজ হেসে বলেছিল, 'আপনাকে বলেনি, ঘড়িটাকে বলেছে। আচ্ছা, এটা আমার কাছে রইল অসিত! আমি সস্তায় ভালো দোকান থেকে সারিয়ে দেব ; বাজে দোকানে দিলে কাজও খারাপ করে, তাছাড়া চুরিও যায়।'

সুপ্রীতি বিস্মিত হয়ে বলছিল, 'ওমা, কি আবার চুরি যাবে ?'

সবোজ তারদিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'যা চুরি যাবার জিনিস, জুয়েল।'

লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সুপ্রীতি। তারপর ফের একটু বাদে বলেছিল, 'দরকার নেই সে সব বাজে দোকানে দিয়ে। আপনার জানাশোনা দোকান থেকে ঘড়িটা সারিয়ে দিন সরোজবাবু, নইলে আপনার বন্ধু ওটাকে দেরাজেই ফেলে রাখবেন।'

সরোজ নিজের মণিবন্ধে অচল ঘড়িটা পরতে পরতে বলেছিল, 'আচ্ছা।'

সে আজ দুমাস হয়ে গেল, এর মধ্যে ঘড়িটা সরোজ আর ফিরিয়ে দিয়ে যায়নি। দুএকখানা পোষ্টকার্ডও ছাড়া হয়েছে, তবু কোন্ সাড়া নেই সরোজের। আচ্ছা বেহুঁশ লোক, মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণীর পক্ষে একদিনও ঘড়ি না হলে চলে !

সুপ্রীতি প্রায় রোজই তাগিদ দিচ্ছিল, 'আচ্ছা, তুমি কি ? জিনিসটা তো তোমার, গরজটাতো তোমার। সরোজবাবুর যদি সময় না থাকে তুমি নিজেই গিয়ে না হয় নিয়ে এস, বেলেঘাটা থেকে বালী উত্তরপাড়া তো আর নমাস ছমাসের পথ নয়।'

শনিবার দুটোয় ছুটি হয়ে গেল অফিস। অসিত ঠিক করল যেমন করেই হোক আজই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে ঘড়ির। আর গাফিলতি করবে না।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল অসিত। প্রথমে ভাবল এখনই বালী চলে যাবে। কিন্তু সরোজের মত ভবঘুরে লোক কি এখন এই দুপুরবেলায় বাড়িতে চুপচাপ বসে আছে? তার চেয়ে একবার বিজয়া কেবিনে খোঁজ নিয়ে গেলে পারে।

নিউ বড়বাজার স্ট্রীটের এই চায়ের দোকানটির মালিক কালিপদ রায়—সরোজ আর অসিতের কমন ফ্রেণ্ড। তার ওখানে বিনা পয়সায় চা খেতে আর আড্ডা দিতে প্রায়ই আসে সরোজ। অসিত ঘুরে ঘুরে সেই দোকানে গিয়ে হাজির হোল।

কাউণ্টারের পিছনে বিরস মুখে বসে আছে কালিপদ। দোকানে খদ্দেরের সংখ্যা কম।

অসিত বলল, 'কি খবর কালিপদ?'

কালিপদের খবর ভালো নয়। দোকান ভালো চলছে না। তার ওপর সেদিন নিতাই নামে একটা বয় ড্রয়ার ভেঙে সাঁইত্রিশ টাকা তের আনা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কালিপদ বলল, 'দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই, বুঝলে অসিত?'

অসিত সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'আমাদের সরোজ দাসের খবর কি হে? শিগগির এসেছিল এখানে?'

কালিপদ বলল, 'ওই আর একজন, যা ধার নিয়েছে তাতো আর দিলই না, সপ্তাহ খানেক আগে আমার দামী কলমটা সারিয়ে দেবে বলে নিয়ে গেছে তো গেছেই; ও কলমের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি অসিত।'

অসিতের প্রাণটা চমকে উঠল, বলল, 'কেন?'

'কেন আবার? আজকাল ওই সবই তো করছে। তোমার কাছ থেকেও কিছু নিয়েছে নাকি? বোসো চা খাও।'

অসিত বসল না, বলল, 'না ভাই কাল এসে চা খাব, আজ জরুরী কাজ আছে।' শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে করে যাওয়া যায়, তাতে কিছু খরচও কম পড়ে। কিন্তু কে জানে গাড়ি এখন আছে কি নেই।

অসিত সে চেষ্টা করল না। বাসের দুই সেকশনে ছ গণ্ডা পয়সা ব্যয় করে পুরো একঘণ্টা পর হাজির হোল সরোজের উত্তরপাড়ার বাসায়।

সদর রাস্তার ওপরে নয়, সরু একটা কানাগলির মধ্যে সরোজের বাসা। পুরনো নোনাধরা একতলা বাড়ি। দরজার কড়াটায় জোরে জোরে নাড়া দিল অসিত।

'কে'? কালো, রোগা একটি বউ এসে দরজা খুলে দিল। একটু যেন থমকে গেল প্রথমটায়। তারপর জীর্ণ আধময়লা শাড়ির আধখানা আঁচল মাথায় তুলে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, 'ও আপনি! আসুন, ভিতরে আসুন।'

অসিত বলল, 'সরোজ আছে?'

নির্মলা বলল, 'একটু বাদেই আসবেন। ঘরে আসুন না।'

ঘরের ভিতরে ঢুকল অসিত। ছোটঘরের প্রায় বারআনি জুড়ে একখানা তক্তপোশ পাতা। একধারে গুটানো বিছানা। মাদুরটা পেতে দিতে দিতে বলল, 'বসুন, তারপর সব ভালোতো? সুপ্রীতিদি ভালো আছেন?' অসিত সংক্ষেপে বলল, 'হুঁ'।

হঠাৎ কোত্থেকে বছর পাঁচেকের একটি ছেলে ছুটে এসে অসিতের প্রায় কোলের কাছে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আজ কি এনেছ কাকাবাবু, লজেন্স না বিস্কুট?'

এর আগে যতবার এসেছে, বন্ধুর এই সুন্দর ছেলেটির জন্য পকেটভরে লজেন্স, বিস্কুট নিয়ে এসেছে অসিত। কিন্তু আজ মনের সে অবস্থা ছিল না।

অসিত কিছু জবাব দেবার আগেই নির্মলা ছেলেকে ধমকে উঠল, 'ছি ছি, কি হ্যাংলাই তুই হয়েছিস হাবুল? রোজই লোকে তোর জন্যে বিস্কুট লজেন্স নিয়ে আসবে নাকি? কেন, ও সব জিনিস কি তুই কোনদিন খাসনে?'

হাবুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'কই খাই? কিছুই তো কিনে দাও না। জানো কাকাবাবু, কিচ্ছু কিনে দেয় না আমাকে। নিজে শিশি ভরে ওষুধ খায়। আমাকে তাও দেয় না।'

হাসি চেপে নির্মলা ফের ধমক দিল, 'যত পাকাপাকা কথা ছেলের। যাও খেলা কর গিয়ে।'

হাবুল আর কোন কথা না বলে ঘরের কোণে নিজের খেলার জায়গায় চলে গেল। বসবার চাটাই, ভাঙ্গা শ্লেট, আর ছেঁড়া বইয়ের পীজবোর্ডের মলাট দিয়ে সেখানে সে নতুন ঘর তুলেছে। সে ঘর বার বার ভেঙে পড়ছে, তবু তার তোলবার বিরাম নেই।

নির্মলা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বামীর বন্ধুর দিকে তাকাল। 'বসুন চা করি।'

অসিত বলল, 'না না, চায়ের দরকার নেই। সরোজ আসুক তারপর বরং চা খাব। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

নির্মলা একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'করুন না।'

অসিত বলল, 'সারিয়ে দেবে বলে সরোজ আমার ঘড়িটা নিয়ে এসেছিল। আর ফেরত দিয়ে এল না। ঘড়ি কি আজও সারান হয় নি?'

নির্মলা বলল, 'তাতো জানিনে ঠাকুরপো, আমি তো সে ঘড়ি দেখিনি।' এই আত্মীয় সম্বোধনে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল অসিতের। মনে মনে বলল, 'তুমি সব জানো, জেনে শুনেও ন্যাকা সাজছ।'

খানিকবাদে সরোজ এসে উপস্থিত হোল। ওর চেহারাটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। চোয়াল-জাগা মুখ, দাড়ি জমেছে দুদিনের। গায়ে লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবী।

সরোজকে দেখে মনে হোল সেও যেন একটু চমকে গেছে।

একটু হেসে বলল, 'তুমি যে, পথ ভুলে!'

অসিত বলল, 'কি করব, তুমি তো আর কোন খোঁজ খবর নিলে না, চিঠি দিলেও জবাব দাওনা; আচ্ছা লোক হয়েছ একজন।'

সরোজ হেসে বলল, 'কি করব বলো? হাতের কাছে পোষ্টকার্ড থাকে না, যখন পোষ্ট অফিসের কাছ দিয়ে যাই তখন আবার পয়সা থাকে না পকেটে।'

অসিত আর বেশি ভূমিকা না করে বলল, 'তারপর আমার ঘড়িটার কি করলে? হয়েছে সারানো?'

সরোজ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না ভাই, রেগুলেট করানোর জন্ম এখনও দোকানেই পড়ে রয়েছে।'

অসিত বলল, 'ঢের রেগুলেট করা হয়েছে। আর দরকার নেই আমার, ঘড়িটা এবার আমায় দিয়ে দাও।' 'আচ্ছা দেব, দুচারদিনের মধ্যেই দিয়ে আসব ঘড়ি।'

অসিত বলল, 'ফেব দুচারদিন? না আজই চল, কোন দোকানে দিয়েছ ঘড়ি, আমি দেখতে চাই। এতদিন লাগে একটা ঘড়ি সারাতে?'

সরোজ কৈফিয়তের স্বরে বলল, 'আমি আর খোঁজ নিতে পারিনি ভাই। বড ঝামেলায় ছিলাম, হাবুলের মাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল। ও নিজেও যেতে যেতে ফিরে এসেছে। অনেক খরচপত্তর হয়ে গেছে।'

বন্ধুর দুরবস্থাব কথায় অসিতের মন ভিজল না। তিক্তস্বরে বলল, 'সেইসঙ্গে আমার ঘড়িটাও গেছে বোধ হয়।' সরোজ হঠাৎ যেন কোন জবাব দিতে পাবল না। চোর যেন হাতে হাতে ধরা পড়েছে।

অসিত জ্বালাভরা কণ্ঠে বলতে লাগল, 'ছিছিছি, তোমার এমন হীন প্রবৃত্তি হবে ভাবতেও পারিনি। এর চেয়ে তুমি আমার কাছে ধার চাইলে না কেন? নিজের হাতে না থাকত, আর পাঁচজনের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে দিতাম। কত সময় তাও তো দিয়েছি। তুমি তার খুব শোধ নিলে। এমন নেমকহারাম আমি আর জীবনে দেখিনি।'

সরোজের স্ত্রীপুত্রের সামনেই অসিত আরো কড়া কড়া কথা বলতে লাগল বন্ধুকে। নির্মলা মুখ নিচু করে রইল। কেবল হাবুল ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল। অসিত বলল, 'কোন দোকানে বিক্রি করেছ ঠিকানাটা দাও আমাকে। আমি নিজে টাকা দিয়ে কিনে নেব। একজনের প্রেজেণ্ট করা জিনিস। ছি ছি ছি।'

কিন্তু সরোজ কিছুতেই ঠিকানা দিল না। শুধু বলল, 'আমি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসব। তোমার ঘড়ি যায়নি।'

অসিত বলল, 'তোমার কথায় আমার আর বিশ্বাস নেই, তুমি যা ফিরিয়ে দেবে তা আমার জানা আছে। চোর, নেমকহারাম, বাটপাড় কোথাকার।'

গালাগালের সমস্ত পুঁজি উজার করে দিয়ে অসিত উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে বন্ধুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সরোজ আর তার স্ত্রী নিস্পন্দ ঠাণ্ডা পাথরের মত রইল স্থির হয়ে।

খানিকটা পথ চলে এসেছে হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেল অসিত, 'কাকাবাবু, ও কাকাবাবু।'

অসিত মুখ ফিরিয়ে দেখল সরোজের ছেলে। ঠিক অবিকল তার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পরণে পুরনো একটা প্যাণ্ট, গায়ে জামা নেই, পা দুটি খালি।

অসিত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কিরে চোরের ব্যাটা চোর, লজেন্স চাই তোমার? বিস্কুট চাই, না? এসো দিচ্ছি।'

কিন্তু এ সব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাবুল অসিতের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কাকাবাবু, বাবা বুঝি তোমার ঘড়ি কেড়ে নিয়েছে? তাই রাগ করছ তুমি?'

অসিত বলল, 'নিয়েছেই তো'। হাবুল বলল, 'আমি ঘড়ি নিয়ে এসেছি কাকাবাবু।'

অসিত উল্লসিত হয়ে উঠল, বলল, 'তাই নাকি? তাহলে ঘড়িটা বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছিল সরোজ। গালাগালি খেয়ে চৈতন্য হয়েছে। থানা পুলিশ কেলেঙ্কারির ভয়ে ফেরত পাঠিয়েছে ছেলের হাতে।'

অসিত হাত পেতে বলল, 'কই দেখি!'

হাবুল হেসে ছোট্ট মুঠি খুলে সবুজ রংয়ের ছোট্ট একটা জাপানী খেলনা রিস্টওয়াচ বের করে অসিতের হাতে দিয়ে বলল, 'মা সেদিন আমাকে কিনে

দিয়েছিল। আমার ঘড়িটা তোমাকে দিয়ে দিলুম কাকাবাবু, তুমি নাও। বাবাকে আর বোকো না, কেমন ?'

হাবুলের সুন্দর ছোট্ট মুখখানির দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল অসিত, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না আর বকব না।'

মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপায়ে বড রাস্তার দিকে চলতে লাগল অসিত, বাস ধরতে হবে। হাবুলের ঘড়িটা ওর হাতের মুঠিতেই রয়ে গেছে। মুঠি খুলে সেই খেলনা ঘড়িটার দিকে আর একবার তাকাল অসিত। তারপর আস্তে আস্তে সেটিকে পকেটে রাখল।

স্মৃতিগন্ধ

নতুন মডেলের গাড়িখানা স্বরাজ ভণ্টের ঠিক সামনে এসে থেমে গেল। গাড়ি থেকে নামল মীনাক্ষী আর তার স্বামী শ্যামলেন্দু। স্ত্রী রূপবতী। আর স্বামী একজন রূপবান না হোক, স্বাস্থ্যবান, পশারবান তরুণ এডভোকেট।

বাঁ দিকে ভণ্টের ইনচার্জের কামরা। মীনাক্ষীর মতোই আরো দুটি সুন্দরী সুসজ্জিতা মেয়ে সেই কামরা থেকে বেরিয়ে আসবার পর স্বামীকে নিয়ে মীনাক্ষী ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই বিস্মিত হয়ে গেল। কয়েকদিন আগে যাঁর সঙ্গে মীনাক্ষী আলাপ করে গিয়েছে ইনি তো তিনি নন।

বিস্ময়ের অবশ্য আরো কারণ ছিল। মীনাক্ষীরা ঘরে ঢুকতেই ইনচার্জ চেয়ার ছেড়ে একটু উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গী করে সবিনয়ে বলল, 'আসুন।' তারপর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে যে দুখানা চেয়ার রয়েছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে স্মিতমুখে আপ্যায়ন করল, 'বসুন।' শ্যামলেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। কিন্তু মীনাক্ষী বসতে পারল না। সে লক্ষ্য করল ভণ্টের ইনচার্জ তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে। মীনাক্ষীও তাই ছিল। এক মুহূর্ত কি ভেবে নিল। তারপর স্থির করল চিনে যখন ফেলেছে তখন সেই পরিচয় স্বীকার করাই ভালো।

ইনচার্জই অবশ্য আগে কথা বলল, 'তুমি!' মীনাক্ষী মুখে হাসি টেনে বলল, 'আশ্চর্য! প্রণবেশ, তুমি এখানে কাজ করছ নাকি।'

প্রণবেশ বলল, 'হ্যাঁ, মাসখানেক হল মানিকতলা থেকে আমি এখানে ট্রান্সফারড হয়ে এসেছি।'

শ্যামলেন্দু তাদের দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ্য করে মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার স্বামী শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রণবেশ সরকার। আমরা স্কটিশে একসঙ্গে পড়েছি।' শ্যামলেন্দু প্রতি নমস্কার করে

হেসে বলল, 'বেশ বেশ। খুব খুশি হলাম মিঃ সরকার। আমরা তাহলে যথা-স্থানেই এসে পড়েছি মীনা। কথায় বলে ওল্ড ওয়াইন এণ্ড ওল্ড ফ্রেণ্ডস।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'উকিল মানুষের জিভ একটু বেশি কথা বলে। তারপর তুমি কেমন আছ প্রণবেশ? তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা সব ভালো তো?'

একটু বেশি সপ্রতিভভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল মীনাক্ষী।

প্রণবেশ তা লক্ষ্য করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তারা ভালোই আছে। তোমার ছেলেমেয়ে'—

মীনাক্ষী বলল, 'ছেলে কই? একটি মেয়ে। এখনো কিণ্ডারগার্টেনের গণ্ডি পেরোয়নি।'

আরো দু-তিন মিনিট খোঁজ খবরের আদান-প্রদান আর সৌজন্য বিনিময়ের পালা চলল। তারপর শ্যামলেন্দু বলল, 'আমার আবার একটু তাড়া আছে। মীনা, আমি বরং উঠি। কাজটা তো তুমিই সেরে আসতে পার। প্রণবেশ-বাবু যখন রয়েছেন তখনতো কোন চিন্তাই নেই।'

মীনাক্ষী স্বামীর কথায় কান না দিয়ে কাজের কথা পাড়ল। 'এখানে গয়না রাখতে এলাম। তোমাদের ভল্ট তো শুনেছি খুব পপুলার হয়েছে।'

প্রণবেশ বলল, 'হ্যাঁ তা হয়েছে।'

এর পর ফরম, সিগনেচার কার্ড, গয়না গচ্ছিত রাখবার ছাপানো নিয়ম কানুন সব বার করে শ্যামলেন্দুর সামনে রাখল প্রণবেশ।

শ্যামলেন্দু স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, 'ফিল ইন করে দাও। কঠিন কিছু না, নাম ঠিকানা সন তারিখগুলি বসিয়ে দিলেই হল।'

মীনাক্ষী স্বামীকে অনুরোধ কবল, 'তুমিই করে দাও না।'

শ্যামলেন্দু ফরমখানা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলল, 'তার মানে ক্লার্কের কাজটা আমাকে দিয়েই করাচ্ছ।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'ক্লার্ক ভাবতে যদি আপত্তি হয় নিজেকে প্রাইভেট সেক্রেটারী মনে করে নাও।'

তাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে কি ঘনিষ্ঠতা তা যেন একটু ইচ্ছা করেই ফলাও করে জানাতে চাইছে মীনাক্ষী। প্রণবেশ তার ভঙ্গী দেখে মনে মনে একটু হাসল।

ফরম পূরণ শেষ হল। শেষ হল কার্ডের ওপর স্পেশিমেন সিগনেচার। শ্যামলেন্দু প্রথমে সই করতে চায় না। স্ত্রীকে বলল, 'আমার আর সইয়ের দরকার কি। গয়নার মালিক তো তুমি। তুমি একাই অপারেট কর না।'

মীনাক্ষী মধুর ভঙ্গী করে বলল, 'কেন, তোমার নাম দিতে আপত্তি কি। যদি আমার অসুখ-বিসুখ করে, তাহলে গয়না তোলার জন্যে তোমাকেই তো আসতে হবে।'

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, 'দেখেছেন প্রণবেশবাবু! খাস বেয়ারার কাজও করাতে চায় আমাকে দিয়ে।'

প্রণবেশ জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল।

পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে তিনখানা দশ টাকার নোট প্রণবেশের দিকে এগিয়ে দিল শ্যামলেন্দু। লকার ভাড়া নেওয়ার এক বছরের চার্জ।

প্রণবেশ বলল, 'এখনই দরকার কি। টাকাটা পরে দিলেও চলবে।'

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, 'দিতেই যখন হবে একটু আগে আর পরেতে কি এসে যায়। মীনাক্ষীর বন্ধু বলে তো আর চার্জ থেকে রেহাই দেবেন না? নাকি দেবেন?'

হো হো করে হেসে উঠল শ্যামলেন্দু। পকেট থেকে নক্সা করা রুপোর সিগারেট কেস বার করে খুলে ধরল প্রণবেশের দিকে।

মীনাক্ষী লক্ষ্য করল স্ত্রীর প্রাক্তন বন্ধুকে যত সহজভাবে নিতে পেরেছে শ্যামলেন্দু, প্রণবেশ বান্ধবীর স্বামীকে তেমনভাবে পারেনি। ও কি সেই সব দিনের কথা এখনো মনে করে রেখেছে?

সস্তা ছাইরঙের স্যুটেও প্রণবেশকে চমৎকার মানিয়েছে। সত্যিই রূপবান পুরুষ প্রণবেশ। কিন্তু বার বছর আগে মীনাক্ষী তো শুধু ওর রূপ দেখেই আকৃষ্ট হয়নি, পরীক্ষার নম্বর দেখেও নয়। মীনাক্ষীর আকর্ষণ বেড়েছিল ওর

বুদ্ধির দীপ্তি দেখে। সেই বুদ্ধি ওর কথাবার্তায় চালচলনে প্রকাশ পেত। চমৎকার আবৃত্তি করতে পারত প্রণবেশ, কলেজ ম্যাগাজিনের সেই ছিল পাণ্ডা, ডিবেটিং-এ ওর জুড়ি ছিল না। কিন্তু সেই উজ্জ্বল দীপ্তিমান প্রণবেশকে আর চিনবার জো নেই। শুধু তার আকারগত সাদৃশ্যই আছে, প্রকার একেবারে বদলে গেছে। এই নিষ্প্রভ, নিস্পৃহ ব্যাঙ্কের কেরাণীটি সম্পূর্ণ যেন আলাদা মানুষ। সেই বাকচতুর প্রণবেশ মীনাক্ষীর স্বামীর একটা কথারও জবাব দিতে পারল না, অতগুলি পরিহাসের জবাবে একটা ধারালো কথাও ওর মুখে জোগাল না। বোকার মত মূক হয়ে বসে রইল প্রণবেশ। এমন করে পালটে গেল কেন? এর মূলে কি আছে? দারিদ্র্য? জীবনস'গ্রাম নাকি আর কিছু? প্রণবেশ কি সেইদিনগুলির কথা এখনো মনে করে রেখেছে? ওর বিষণ্ণ গাম্ভীর্য দেখে তাইতো মনে হয়।

প্রণবেশ আবার কাজের কথা পাড়ল। শ্যামলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা তাহলে গয়নাগুলি কবে রাখতে আসছেন?'

শ্যামলেন্দু বলল, 'কবে মানে? আজই সব রেখে যাবে মীনাক্ষী। ও একেবারে তৈরী হয়ে এসেছে।'

হাতের রঙিন থলিটি দেখিয়ে বলল, 'এই যে ব্যাগটি দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যেই আমার স্ত্রীর হৃৎপিণ্ড।'

মীনাক্ষী প্রণবেশের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি সুমিতার সঙ্গে আর একদিন এসেছিলাম, সব দেখে শুনে গেছি। সেদিন তোমার চেয়ারে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন।'

প্রণবেশ বলল, 'হ্যাঁ অতুল সান্যাল। আমি ছুটিতে থাকায় সে আমার জায়গায় কাজ করছিল।'

গয়নার বাক্স নিয়ে এসেছে মীনাক্ষী। আগের দিন তাদের পাশের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। গয়নাগুলি নিজেদের কাছে রাখা আর নিরাপদ নয়। ঝি-চাকর কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? তাই গয়নাগুলি আজই ডিপজিট ভল্টে রেখে নিশ্চিন্ত হবে মীনাক্ষী।

প্রণবেশ বলল, 'তাহলে চল।' শ্যামলেন্দুকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে একটু হেসে বলল, 'আসুন।'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই সিঁড়ি। বিশ পঁচিশ ধাপ সিঁড়ির নিচে সুড়ঙ্গঘর। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সুন্দর ব্যবস্থা। বাইরে পাখার হাওয়ায় গরম কাটছিল না, কিন্তু এখানে এসে সর্বাঙ্গ যেন শীতল হয়ে গেল মীনাক্ষীর।

সুরঙ্গের দ্বারে বন্দুকধারী আর এক প্রহরী। সসম্ভ্রমে সবাইকে সেলাম জানিয়ে দোর ছেড়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। চাবির গোছা হাতে প্রণবেশের বেয়ারা এল সঙ্গে সঙ্গে।

ভল্টের দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য খোপ। প্রত্যেকটি খোপের আলাদা নম্বর। প্রণবেশের নির্দেশে বেয়ারা তিনশ পঁচিশ নম্বর লকার খুলে সরু একটি দেরাজ টেনে বার করল। তাকে সরিয়ে দিয়ে এবার এগিয়ে এল প্রণবেশ। শ্যামলেন্দুর দিকে চেয়ে বলল, 'এইটা আপনাদের।'

তারপর একটা চাবি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন। একটা চাবি আপনাদের কাছে থাকবে আর একটা আমার কাছে।'

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, 'কি সর্বনাশ, আপনি যদি আপনার চাবি দিয়ে খুলে সব সরিয়ে ফেলেন ? যদি রক্ষক হয়ে ভক্ষক হন তাহলে ?'

প্রণবেশ মৃদু হাসল, 'না, সে ভয় নেই। আমি ইচ্ছা করলেও আপনাদের লকার খুলতে পারব না। আমার চাবিতে বন্ধ হবে, কিন্তু খুলবে আপনাদের চাবিতে।'

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, 'দেখবেন মশাই, চাবি যেন অদল বদল না হয়ে যায়।'

কাশ্মীরী কাঠের তৈরী গয়নার বাক্স। ডালার ওপরে সূক্ষ্ম কারুকার্য। আস্তে আস্তে গয়নাগুলি বার করে দেখতে লাগল মীনাক্ষী। প্রণবেশ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। মীনাক্ষী তাকে ডেকে বলল, 'কি কি গয়না রাখছি দেখ এসে ?'

প্রণবেশ একটু হেসে বলল, 'আমাদের তো দেখবার দরকার নেই। গয়নার কোন লিষ্ট আমরা রাখিনে। শুধু লকারের চাবি রাখি।'

মীনাক্ষী বলল, 'সে কি কথা। যদি পিতল রেখে সোনা দাবি করি, সোনা রেখে হীরে? মিলিয়ে নেবে না?'

প্রণবেশ বলল, 'না। আমাদের মিলিয়ে নেওয়ার দরকার নেই।'

মীনাক্ষী মনে মনে ভাবল কেবল দরকার নেই আর নিয়ম নেই। এ ছাড়া কি মুখে আর কোন কথা নেই প্রণবেশের?

কাঠের বাক্স একটু বেশি চওড়া। লকারের মধ্যে ধরল না।

প্রণবেশ বলল, 'বাক্সের দরকাব কি। একটা কাগজ কি রুমাল-টুমাল দিয়ে জড়িয়ে রাখ। তাতেও বেশ ভালো থাকবে।'

মীনাক্ষী জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ক্ষতি হবে না তো?'

শ্যামলেন্দু বলল, 'আঃ, উনি তো বলছেন রাখতে। তবু তোমার ক্ষতির আশঙ্কা যাচ্ছে না? কি রকম বন্ধুত্ব ছিল তোমাদের?'

লকার বন্ধ করবাব পর কোণের দিকে দুটি কেবিন চোখে পড়ল মীনাক্ষীর। জিজ্ঞাসা করল, 'ও আবার কি?'

প্রণবেশ বলল, 'ওখানে ঘেরা জায়গা আছে, ইচ্ছা করলে ওখানে গিয়ে গয়না-টয়না পরতে পার।'

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, 'ফাঁদের কোন ব্যবস্থাই বাকি নেই দেখছি।'

প্রণবেশ এ পরিহাসেরও কোন জবাব দিল না।

মিনিট দশেক বাদে সবাই ফের ওপবে উঠে এল। প্রণবেশ ওদের ব্যাঙ্কের বড় দরজা অবধি এগিয়ে দিল।

মীনাক্ষী বলল, 'সপ্তাহে কবার আমি আমার লকার খুলতে পারি?'

প্রণবেশ বলল, 'যতবার ইচ্ছে।'

কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে বহুবার আসবার ইচ্ছা হলেও মীনাক্ষী এল না। না এলেও প্রণবেশের কথা তার মনে পড়তে লাগল। অত ঠাণ্ডা অত নিরুত্তাপ

হয়ে রইল কেন প্রণবেশ? ভিতরটা ওর আজও জ্বলে যাচ্ছে, তাই? কিন্তু দোষ কী মীনাক্ষীর একার? কলেজে পড়তে পড়তে চার বছর ধরে তাদের যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা কি কেবল একজনের দোষে ভাঙে? তুজনে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে ঠিক হয়ে গেলেও মীনাক্ষী শেষ পর্যন্ত বেরোতে পারেনি। সে পরে চিঠিতে জানিয়েছিল, 'বাবা-মা টের পেয়ে গেছেন। চারদিকে কড়া পাহারা। বড্ড ভয় করছে পারলাম না।'

প্রণবেশ সে চিঠির কোন জবাব দেয়নি, তারপর আর দেখাসাক্ষাৎও করেনি। নিশ্চয়ই ভেবেছে ভয়টা মীনাক্ষীর বাইরের নয়, ভিতরের। অভাবটা সাহসের নয়, ভালোবাসার। সময়ের প্রলেপে সব মান অভিমান তুঃখ জ্বালার নিবৃত্তি হয়েছে। এখন আছে শুধু কৌতূহল। প্রণবেশ কি সে কথা মনে রেখেছে? যদি রেখে থাকে কিভাবে রেখেছে?

তাকে জিজ্ঞাসা করবার ফের একটা উপলক্ষ্য ঘটল। ভবানীপুরে মীনাক্ষীর মাসতুতো বোনের বিয়ে। গয়নাগুলি নিয়ে আসা দরকার।

শ্যামলেন্দু কোর্টে বেরিয়ে গেছে। মীনাক্ষীর মেয়ে বেবী স্কুলে। শাশুড়ী ঘুমোবার উদ্যোগ করছেন। স্তব্ধ তুপুর। মীনাক্ষী তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। শাশুড়ী বলে দিলেন, 'সাবধানে এসো মা, গয়নাগাটির ব্যাপার। নাকি চাকরটা সঙ্গে যাবে?'

মীনাক্ষী বলল, 'তার দরকার নেই মা। এই তো এখান থেকে ওখানে। যাব আর আসব।'

প্রণবেশের ঘরে আজও মেয়েদের ভিড়। হাসির শব্দ। শুধু মেয়েদের নয়, প্রণবেশেরও। ঈর্ষার খোঁচা খেল মীনাক্ষী।

খানিকক্ষণ বাদে তাকে ভিতরে ডাকবার ফুরসত পেল প্রণবেশ।

মীনাক্ষী গিয়ে বসল তার সামনের চেয়ারে।

প্রণবেশ বলল, 'এই যে এস। শ্যামলেন্দুবাবু কোথায়?'

মীনাক্ষী বলল, 'কোর্টে বেরিয়েছেন। কেন, তুমি কি তাঁকে ছাড়া ভরসা পাও না?'

প্রণবেশ বলল, 'ভয়ের আর কী আছে মীনাক্ষী ?'

মীনাক্ষী বলল, 'থাক, কাজটা তুমি খুব ভালোই পেয়েছ।'

প্রণবেশ বলল, 'কি রকম ?'

মীনাক্ষী বলল, 'মেয়েদের গয়না আগলানো। এই উপলক্ষ্যে কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়, বন্ধুত্ব হয়।'

প্রণবেশ বলল, 'আলাপ হওয়া আর বন্ধুত্ব হওয়া কী এক জিনিস? সে কথা যাক। তুমি কি লকার খুলতে এসেছ ?'

যেন অফিসেব কাজ ছাড়া আব কিছু বোঝে না প্রণবেশ। বেশ, তাই হবে। কাজ সেরে মীনাক্ষী এখনই বিদায় নিচ্ছে।

মীনাক্ষী বলল, 'হ্যাঁ, আর কি জন্যে আসব।'

প্রণবেশ বলল, 'আচ্ছা।'

মীনাক্ষীর সামনে একখানা খাতা ধরে প্রণবেশ বলল, 'এইখানে সই কর। ডেট আর টাইম বসাও। ব্যস, এতেই হবে।'

বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে প্রণবেশ এগিয়ে চলল। মীনাক্ষী গেল পিছনে পিছনে।

আতপ নিয়ন্ত্রিত সেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড ভল্ট। বকশিশকামী দারোয়ানের সেলাম। প্রণবেশ এগিয়ে গিয়ে মীনাক্ষীর লকার খুলে দিযে এল। বলল, 'আধখানা মাত্র খুলেছে। এবার তোমার চাবি ঘোরাও তাহলে পুরোপুরি খুলবে। বন্ধ কববার সময় হলে আমাকে ডেকো।'

বলে প্রণবেশ অনেক দূরে গিয়ে দারোয়ান আর বেয়াবার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

মীনাক্ষী মনে মনে ভাবল কি ভীরু প্রণবেশ! কেন কাছে দাঁড়ালে কি জাত যেত ? না কি মীনাক্ষী সেদিনের কোন কথা তুলে তাকে বিব্রত করত ? মানমর্যাদা প্রণবেশের আছে, মীনাক্ষীর কি নেই ? ঢের বেশি, ঢের বেশি আছে।

মীনাক্ষী এই ঔদাসীন্যের শোধ নিল। গয়না বাছতে অনেক দেরি

করল। তিন গাছা হারের কোন গাছা নেবে যেন কিছুতেই মন স্থির করতে পারছে না।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে প্রণবেশ ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল, 'কি ব্যাপার? এত দেরি করছ যে। ওপরে আমার অনেক কাজ রয়েছে।'

মীনাক্ষী বলল, 'কিন্তু আমার কাজও তো শেষ হয়নি।'

সেই ঘেরা জায়গায় গিয়ে মীনাক্ষী আরো কিছুক্ষণ দেরি করল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জড়োয়ার হারটা পরল। সাদা পাথর বসানো ফুল দুটির বদলে লাল পাথরের ফুল পরল। তারপর আরো দু-তিন মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবল।

প্রণবেশ অধীর হয়ে তাড়া দিচ্ছে, 'তোমার হল মীনাক্ষী?'

এবার মীনাক্ষী বেরিয়ে এল। প্রণবেশের সামনে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

প্রণবেশ সে কথার জবাব না দিয়ে একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'চল। আমার আর দেরি করবার সময় নেই।'

লকার বন্ধ করতে যাচ্ছে প্রণবেশ হঠাৎ মীনাক্ষী বলল, 'দাঁড়াও, আমার আর একটু দরকার আছে।'

তারপর লকারের ভিতরটা হাতড়ে নীলা বসানো একটি আংটি বার করল। প্রণবেশের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে পেরেছ?'

এতক্ষণে একটু যেন ছল ছল করে উঠল প্রণবেশের চোখ।

আস্তে আস্তে বলল, 'পেরেছি। রেখে দাও।'

আংটিটা লকারে বন্ধ করে রাখল না মীনাক্ষী। আঙুলে পরে বেরিয়ে এল।

পথে আসতে আসতে মীনাক্ষী মনে মনে বলল, 'সে আংটি আর নেই। এ আংটি তোমার দেওয়া আংটি নয়। আর একজনের। কিন্তু তোমার ওই ছলছল দুটি চোখ দেখবার জন্যে এই ছলনাটুকুর দরকার ছিল। আমাকে ক্ষমা কোরো প্রণবেশ।'

কেরামত

'ফকির দরবেশকে কিছু খয়রাত করবেন মাঠাকরুন, খোদাতাল্লা সুখে রাখবেন আপনাদের।'

কাঁধে জীর্ণঝুলি, পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, খোলা গায়ে বুকভরা কালো কালো লোম, মাথায় ছোট শাদা একটি ময়লা টুপি তেরছা করে পরা—মফিজদ্দি ফকির এসে মজুমদারদের উঠানের ওপর দাঁড়াল। তারপর আর একবার করুণ মোলায়েম কণ্ঠে ডাক দিল, 'মা, ওমা, ও মাঠাকরুন।'

সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে হবিষ্যান্ন করতে যাচ্ছিলেন হৈমবতী, উঠানে ভিখারীর গলা শুনে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'খয়রাত নেওয়ার তোমাদের কি একটা সময় অসময় নেই বাছা। এই ভর দুপুরের সময় এসেছ খয়রাত নিতে?'

চালের বড় মেটে হাঁড়ি থেকে দুমুঠো চাল সরায় তুলে নিয়ে দোর খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন হৈমবতী, যত অসময়েই ভিখারী এসে উপস্থিত হোক্ ভিক্ষা তাকে গৃহস্থের দিতেই হয়।

আষাঢ়ের মেঘভাঙ্গা রোদ বড় চড়া হয়ে উঠেছে। করোগেট টিনে ছাওয়া ঘর। তার কানাচের ছায়ায় এসে সরে দাঁড়িয়ে ঝুলিটি ফাঁক্ করে ধরল মফিজদ্দি। পৈঠার ওপর দাঁড়িয়ে সরাটি সেই ঝুলির মধ্যে হৈমবতী উপুড় করে দিলেন।

মফিজদ্দি ঝুলির দিকে তাকাল না। ঝরঝর করে চাল পড়বার শব্দটুকু শুনতে শুনতে হৈমবতীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'মনে কি অশান্তি আছে মা? বলুন, ফকির দরবেশের কাছে খোলসা করে বলুন, খোদা আসানে রাখবেন।'

হৈমবতীর মুখের দিকে তাকালে তাঁর মনের অশান্তির কথা সহজেই টের পাওয়া যায়। ষাটের কাছাকাছি বয়স। যৌবনে যে সুন্দরী ছিলেন তা তাঁর গায়ের রঙ আর মুখের গড়ন দেখলে বোঝা যায়। এখনো সেই ক্ষীয়মান

সৌন্দর্যের সঙ্গে দুঃখ আর দুশ্চিন্তার ছাপ অদ্ভুত ভাবে মিশে রয়েছে। কোটরগত দুটি চোখে বিবর্ণ নিষ্প্রভ দৃষ্টি। কপালে তিন চারটি বলি রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাথায় খাটো শাদা থানের আঁচলের তলায় খাটো করে ছাঁটা কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুলগুলির কিছু কিছু রয়েছে খাড়া হয়ে। ফকিরের তীক্ষ্ণ অভ্যস্ত দৃষ্টিতে হৈমবতীর মনের অশান্তি গোপন রইল না।

ফকির দরবেশ শব্দ দুটি শুনে হৈমবতী একটু যেন সমীহর সঙ্গে তাকালেন মফিজদ্দির দিকে। এ তাহলে সাধারণ ভিখারী নয়, গুণিন ফকির দরবেশ। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের রোগাটে সাধারণ একটি মুসলমান। চাপ-দাড়ি সত্ত্বেও গালের তোবড়ানো ভাবটি ধরা যায়। আলকাতরার মত রঙ। গলার নিচে দুটো হাড় জেগে উঠেছে। ডানদিকের কাঁধের ওপর এক খণ্ড দাদ। ভারি কুশ্রী চেহারা। তবু কেমন যেন মায়া হয় দেখলে। কিন্তু বোধ হয় ধরন একটু রোগাটে বলেই, ছোট ছোট চোখ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রক্তাভ তার রঙ, দৃষ্টির মধ্যে অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা আছে। সেই চোখ দুটি স্থির হয়ে তাকিয়ে রয়েছে হৈমবতীর দিকে। একটু যেন শিউরে উঠলেন, ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন হৈমবতী। হঠাৎ তাঁর মনে হোল এই দুর্বল ক্ষীণপ্রাণ লোকটির মধ্যে কি একটা অলৌকিক শক্তি যেন রয়েছে।

কালো পুরু পুরু ঠোঁটে অভয় দানের ভঙ্গীতে মফিজদ্দি প্রসন্ন ভঙ্গীতে হাসল। সামনের কয়েকটি দাঁত থেকে আভাস এল হল্‌দে রঙের।

মফিজদ্দি বলল, 'বলুন, মা বলুন, কিসের দুঃখ আপনার, কিসের এত চিন্তা ভাবনা। কি ঢুকেছে আপনার ঘরে? কোন ব্যামোপীড়া না কোন মামলা মোকদ্দমা।'

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হলেন হৈমবতী। সব জানে, এ নিশ্চয়ই সব জানে। হৈমবতী তদ্গত ভাবে বললেন, 'যদি জানোই সব, ছল করছ কেন ফকির। আজ ক'দিন ধরে কলকাতায় হাজতে আছে আমার ছেলে। অমন শান্ত নিরীহ মানুষ, না জানি কি কষ্টেই দিন কাটছে তার হাজতের মধ্যে। আচ্ছা,

পুলিশের কি চোখ নেই সঙ্গে। মানুষকে ধরবার সময় কি তারা মুখের দিকে তাকায় না। মুখের দিকে চাইলেই তো ধরন বোঝা যায়, মানুষের মন বোঝা যায়। বোঝা যায় কে দোষী, কার দোষ নেই।'

মফিজদ্দি বলল, 'আমার মনও সেই কথা বলছিল ঠাকরুন। কর্তা তাহলে আটকা আছেন শহরেব হাজতে।'

হৈমবতী বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, জেলেব চেয়েও নাকি সেখানে বেশি কষ্ট। বাস্তায় হোলো দাঙ্গা হাঙ্গামা, আর জোর করে টেনে নিয়ে গেল তাকে ঘর থেকে। অমন শান্ত মানুষ, তাকে কিনা জড়াল খুনেব দায়ে। অবশ্য আমার ছোট ছেলে লিখেছে ভয়ের নাকি কিছু নেই। বড উকিল দেওয়া হয়েছে। চিন্তা করতে মানা কবেছে সে। কিন্তু সে তো লিখেই খালাস। চিন্তা না করে আমি পারি কি কবে। আব চিন্তা করেও তো টিকতে পারি না। ভেবে ভেবে মাথার আমার আব কিছু নেই বাপু। এর চেয়ে পাগল হয়ে গেলে বাঁচতাম।'

মফিজদ্দি কানাচ থেকে ঘুরে এসে সব চেয়ে নিচের পইঠার ওপর দাঁড়াল, 'ভাবনা চিন্তার তো কথাই মা। তা উকিল তো লাগিয়েছেন গুণজ্ঞান কিছু করছেন তো সেই সঙ্গে?'

হৈমবতী বললেন, 'করেছি বইকি বাবা। শনি সত্যনারায়ণের পুজো দিযেছি। পাঁঠা মানত করেছি কালী বাড়িতে। সিন্নি মানত করেছি সোনাপুরের দবগায়। যেখান থেকেই হোক এখন ভগবান যদি একটু মুখ তুলে চান—'

মফিজদ্দি বলল, 'চাইবেন বই কি মা চাইবেন। খোদা কি কাউকে না দেখে পারেন। কিন্তু আরো কিছু গুণজ্ঞান আপনাকে করতে হবে যে মা। সব নসিবের ফের কি না মা, গুণজ্ঞান তুকতাক কিছু না কবলে ফের কাটেনা, কষ্ট ঘুচতে চায় না নসিবের।'

হৈমবতী বললেন, 'তাহলে ও সবও তোমার জানা আছে। ছল কোরো না বাপু, সত্যি করে বলো। আমার মনে হচ্ছে সব জানো তুমি।'

মফিজদ্দি মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভালো একটা দাওয়াই বোধ হয় লেগে গেল এবার। ইদানীং পসার প্রতিপত্তি তার প্রায় নেই বললেই চলে। ভদ্রলোক তো দূরের কথা, অশিক্ষিত গরীব মুসলমান নমঃশূদ্র পাড়ায়ও তার তুকতাক ঝাড়ফুকে সহজে কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না। রোগ হলে তারা ডাক্তারের কাছে যায়, সাধ্যে না কুলালে এক টাকা ভিজিট দিয়ে দেখায় কম্পাউণ্ডারকে। আর মামলা মোকদ্দমায় পড়লে শহরে গিয়ে উকিল মুহুরীর বাড়ি ছুটোছুটি করে। ঘটিবাটি জমি জিরাত বিক্রি করে উকিল মোক্তারের হাতে ধরে দেয়। মফিজদ্দির কাছে বড় একটা কেউ আর আসতে চায় না। দিনকাল একেবারে বদলে গেছে। দয়া করে খুদ কুঁড়ো দুএক মুঠো তার ঝুলিতে কেউ কেউ ফেলে দেয়। কিন্তু তার বিনিময়ে মফিজদ্দিরও যে কিছু দেবার আছে তা কেউ স্বীকার করে না। গুণিনগিরির ব্যবসা প্রায় নষ্ট হবার জো হয়েছে। চণ্ডীপুরের মত ব্রাহ্মণ কায়েতের গাঁয়ে রীতিমত সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাড়িতে যে তার এমন বিশ্বাসী ভক্ত একজন এ সময় জুটে যাবে মফিজদ্দি তা প্রত্যাশা করেনি।

হৈমবতীর মুখেব দিকে তাকিয়ে একটু নিগুঢ় রহস্যময় ভঙ্গীতে মফিজদ্দি হাসল, 'জানাশোনা কিছু কিছু আছে বইকি মাঠাকরুন। না হলে খোদা এ সময়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠাবেন কেন। কিন্তু গুণজ্ঞান সব জায়গায় করতে যাওয়া ওস্তাদের নিষেধ আছে ঠাকরুন। যেখানে ভক্তি ছেদ্দা আছে, বিশ্বাস আছে, সেখানেই কেবল কাজ করবার হুকুম আছে ওস্তাদের।'

হৈমবতী বলে উঠলেন, 'সব আছে ফকির, বিশ্বাস ভক্তি সব আমার আছে। আমাকে ভুলিওনা আর, দাওয়ায় এসে উঠে বসো। আমার ছেলের যাতে ভালো হয়, ছেলে যাতে নিষ্কৃতি পায় তার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে বাবা।'

খুশি হয়ে দাওয়ায় উঠে ছোট্ট জলচৌকিখানার ওপর বসতে যাচ্ছে মফিজদ্দি হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে কার মিষ্টি গলা শোনা গেল, 'মা! কি শুরু করেছেন আপনি। খেতে আসুন।' কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল মফিজদ্দি।

হৈমবতী ভেজানো দরজার ফাঁকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি আবার শুরু করব। শুনলে তো সব ফকিরের কথা।'

ঘরের ভিতর থেকে জবাব এল, 'শুনেছি। আপনিও যেমন, ওসব বুজ-রুকিতে আজকাল আবার বিশ্বাস করে নাকি কেউ? ওসব বিদায় করে দিয়ে এবার খেতে চলুন আপনি। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

রেগে উঠলেন হৈমবতী, 'যাক্। আমি যে কবে ঠাণ্ডা হব, সেই দিন গুনছি এখন। ঘাড়েব উপর এমন যে বিপদ তাতেও তোমার নাওয়া খাওয়া শোয়া ঘুমোনোর একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, কি শান্তিতেই যে আছ তুমি, তা তুমিই জানো। আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রাখ বউমা, আমার এখন খাওয়া হবে না।'

তারপর মফিজদ্দির দিকে তাকিযে হৈমবতী বললেন, 'হ্যাঁ বাপু, এবার কি করতে হবে বলো।'

ঘরের ভিতরের মিষ্টি গলা তখনো কানেব মধ্যে বাজছিল মফিজদ্দির। যদিও তার সুরটাই শুধু মধুব কথাগুলি নয়,—তবু মফিজদ্দি একবার সেই দোবের ফাঁকের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিযে এনে হৈমবতীর দিকে চেয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি কিসের মাঠাককন, আপনি বরং ততক্ষণ সেবাটি সেরে আসুন, আমি এখানে বসছি। আর বউ ঠাকরুনকে বলুন দয়া করে এক ছিলিম তামাক আমাকে ফেলে দিতে। একটি দেশলাই, আর একটু নারকেলের ছোবড়া, হুঁকো কলকে তো এখানেই আছে দেখছি। কলকেটা তুলে দিন ঠাকরুন, ও হুঁকো বোধ হয় আমাদের নয়।'

দেয়ালে ঠেস দেওয়া হুঁকোটির দিকে তাকিয়ে হৈমবতী বললেন, 'না ওটি নয়, তোমাদের জন্যও আলাদা হুঁকো আছে ফকির, দিচ্ছি।'

হুঁকো থেকে কল্‌কেটি তুলে নিয়ে ফকিরের সামনে রাখলেন হৈমবতী তারপর দাওয়ার দক্ষিণ দিকের খুঁটিতে ঠেস দেওয়া মুসলমানদের জন্য রাখা ছোট আর একটি হুঁকো নিয়ে এসে মফিজদ্দির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও।'

তারপর ঘরের ভিতরের দিকে চেয়ে ডাকলেন, 'বউমা !'

কোন সাড়া এলো না।

চটে উঠে হৈমবতী রুক্ষস্বরে বললেন, 'আমার কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে না, উত্তরা? লোক এসে একটু তামাক আগুন চাইলে পাবে না তোমাদের বাড়িতে? ভালো জ্বালা হয়েছে আমার। একছিলিম তামাক ফেলে দিতে পারবে না এখানে, আমায় নিজে উঠে গিয়ে আনতে হবে।'

উত্তরার শান্ত কণ্ঠ শোনা গেল, 'দিচ্ছি মা, কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না, খেতে আসুন এবার।'

একটু বাদে দরজার ফাঁক দিয়ে একছিলিম তামাক আর দেশলাই চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে দাওয়ার মেঝেয় ফেলে দিল উত্তরা। যতটুকু সময় দেখা গেল সেই হাতখানির দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল ফকির। গৌরবর্ণ, নিটোল, সুন্দর একখানি হাত। ধবধব করছে সরু একগাছা শাঁখা। তার সঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্ করছে দুগাছি সোনার চুড়ি।

তামাকটুকু আর দেশলাইটি কুড়িয়ে এনে মফিজদ্দি কল্‌কিতে তামাক সাজতে সাজতে বলল, 'বউঠাকরুন যখন অত করে বলছেন, আপনি খেয়েই আসুন ঠাকরুন।'

হৈমবতী ম্লান একটু হাসলেন, 'আমার খাওয়ার জন্য তোমাদের কাউকে ভাবতে হবে না ফকির। এই দশদিন ধরে খাওয়া দাওয়া আমার ঘুচে গেছে। ভাতের পাথর নিয়ে কেবল বসি আর উঠি। কিছু রোচে না মুখে। দুচোখের পাতা এক করতে পারি না রাত্রে। একটু যদি চোখ বুজি যত রাজ্যের হিজিবিজি অনাসৃষ্টি—'

অসহিষ্ণু উত্তরা আবার ডেকে উঠল, 'ঘরে আসুন মা। ভিতরে এসে একবার শুনে যান। দোহাই আপনার।'

বিরক্ত হয়ে হৈমবতী উঠে গেলেন ঘরে, বললেন, 'কি বলছ।'

উত্তরা বলল 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! যাকে দেখবেন তার কাছেই ওসব বলতে শুরু করবেন? ফকিরে কি করবে এসব ব্যাপারের?

বলে দিন ওকে তামাক খেয়েই যেন ও· চলে যায় এখান থেকে। চাল পেল, তামাক পেল আবার কি চায় ও। ওকে বিদায় করে দিয়ে এবার দয়া করে খেতে আসুন আপনি। দেখুন বেলা কোথায় গেছে।'

সব কথা কানে গেল মফিজদ্দির। সে যাতে শুনতে পায়, এবং শুনে চলে যায় সেইজন্যই কথাগুলি একটু জোরে জোরে বলছিল উত্তরা।

মনে মনে রাগ হল মফিজদ্দির কিন্তু হতাশ হোল না। অমন এক ফোঁটা বউকে যদি সে বশ না করতে পারে তো মিথ্যাই তার জারিজুরি। এমন মিষ্টি গলা বউটির কিন্তু কথাগুলি অমন বিষের মত কেন। এত তাচ্ছিল্য তাকে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আজকাল অবশ্য অনেকেই করে কিন্তু অমন চমৎকার যার গলা, শাঁখা চুড়ি পরা অমন সুন্দর যার হাত তার মুখের কটু ভাষা যেন নতুন করে আঘাত করল মফিজদ্দিকে, দ্বিগুণ জ্বালা ধরিয়ে দিল বুকে।

হৈমবতীর গলা শোনা গেল, 'চুপ চুপ, ছিঃ। কি তুমি বলছ বউমা। একটুও কি কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার। যার স্বামী অমন বিপদের মধ্যে তার মুখে কি ওসব কথা মানায ? তার কি সাজে কাউকে হেনস্তা অবহেলা করা ? অমন নাস্তিকের মত মতিগতি যদি তোমাদের না হবে তাহলে আর কপালে এসব ঘটবে কেন ? অনেক বলে কয়ে সেধে ভজে ফকিরকে আমি এনে বসিয়েছি। ওকে তুচ্ছ কোরো না, খবরদার। অমঙ্গলের তাহলে আর কিছু বাকি থাকবে না।'

বলতে বলতে গাটা যেন শির শির কবে উঠল হৈমবতীর।

উত্তরা বলল, 'কেবল আমি কেন আজকাল কেউ ওসব ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে না মা। বুঝিয়ে সুজিয়ে ওকে বিদায় করে দিয়ে আসুন। ভিক্ষা তো পেয়েছে এবার চলে যাক। ওর তুকতাকের কোন দরকার নেই আমাদের।'

হৈমবতী চডা গলায় বললেন, 'তোমার না থাক আমার আছে। ছেলের মঙ্গলের জন্য আমি সব বিশ্বাস করি, সব করতে পারি। দুচার পাতা বই পড়ে মহাপণ্ডিত হয়েছ কিনা তুমি, আমার কথা তোমার গ্রাহ্য হবে কেন।

স্বামীর মঙ্গলামঙ্গলের চেয়ে নিজের বিশ্বাস অবিশ্বাসই যখন তোমার কাছে বড়—'

আবেগে হৈমবতীর গলা রুদ্ধ হয়ে এল, ছল ছল করে উঠল চোখ।

উত্তরা চুপ করে রইল। কিছু দিন ধরে এই রকমই শুরু করেছেন হৈমবতী। তাকে বকছেন, ধমকাচ্ছেন, নালিশ করছেন পাড়াপড়শীর কাছে, স্বামীর বিপদে উত্তরা নাকি তেমন উদ্বিগ্ন হয়নি, দুশ্চিন্তার লক্ষণ তার আচার আচরণে কথা বার্তায় নাকি কিছু বোঝা যায় না। অতি দুঃখে হাসি পেল উত্তরার। স্বভাবটা তার চাপা ধরনের। নিজের দুঃখ দুশ্চিন্তার অংশ অন্যকে সহজে সে পৌঁছে দিতে পারে না। নিজের মধ্যে সবটুকু সে ধরে রাখতে চায়। অন্যের কাছে ধরা দেওয়ায় তার সঙ্কোচের অন্ত নেই। বুকের ভার মুখের হাসিতে সে লুকিয়ে রাখে। সেই তার আধুনিক শিক্ষা আর আভিজাত্য। দুঃখ ভোগে কাউকে সে সঙ্গী করতে জানে না, এমন কি শাশুড়ীকেও নয়। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যায় উত্তরা, সেবা করে খুড়শ্বশুরের। নিজের দুঃখ নিঃশব্দে বহন করে নিজের মধ্যে। আর তার এই নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা সব চেয়ে দুঃসহ লাগে হৈমবতীর। সুব্রত তো কেবল উত্তরার স্বামীই নয়, তাঁরও তো ছেলে। তার বিপদ, তার অমঙ্গল তো তাঁদের দুজনের বুকেই আঘাত হেনেছে তবু উত্তরা কেন এড়িয়ে যায় তাঁকে, কেন তাঁর চোখের জলে চোখের জল মিশায় না। দুঃখ যখন দুজনের এক তার প্রকাশ এমন আলাদা আলাদা কেন।

উত্তরা তাঁকে সান্ত্বনা দেয়, আশ্বাস দেয়, ভরসা দেয় কিন্তু তাঁর ব্যাকুলতায় নিজের ব্যাকুলতা মিশিয়ে দেয় না। মনে হয় যেন মোহ মুদ্গরের শ্লোক দিয়ে গড়া উত্তরা কিন্তু মোহ দিয়ে যে গড়া সংসার, মায়া আর মোহেই যে তার রূপরস।

হৈমবতীর কথার জবাবে উত্তরা এবারও তার সেই অভ্যস্ত যুক্তির আশ্রয় নিল, ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু এ সব বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর তো তাঁর মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে না মা। তাছাড়া আপনার ছেলের মতামতও তো

আপনি জানেন। তিনিও তো এ সব বিশ্বাস করেন না। তিনিও তো সহ্য করতে পারেন না ও সব কুসংস্কার।'

হৈমবতী বললেন, 'তাই বলে তার সঙ্গে তোমার তুলনা? পুরুষ মানুষ হয়ে সে যা করবে তুমিও তাই করতে চাও? পুরুষে বাইরে কত রকম কি বলে, কত রকম কি করে কিন্তু ঘরের মধ্যে সে সব কথায় কান দিলে চলে মেয়েদের? বেশ করো তোমার যা ইচ্ছা। তোমার কোন সাহায্যে দরকার নেই আমার। বিদ্যাবুদ্ধির গুমর নিয়ে তুমি থাকো, যা করবার আমিই করতে পারব।'

রাগ করে ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন হৈমবতী। মনকে যথা সম্ভব শান্ত করবার চেষ্টা করে ফকিরকে বললেন, 'কি কি জিনিসপত্তরের দরকার তোমার বাপু বলো, আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

ব্যবস্থা যে কোন একজন করলেই অবশ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় মফিজদ্দির। ঝাড়ফুঁক, জলপডা, তেলপড়া যা হোক একটা কিছু করে পাঁচ সিকে পয়সা, দরগার নামে সোয়া সের চাল হৈমবতীর কাছ থেকেই দিব্যি আদায় করা চলে, কিন্তু উত্তরাকে স্বমতে আনতে না পারলে কিছুতেই চলবে না মফিজদ্দির। তার লেখাপড়া আর বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার না ভাঙতে পারলে শান্তি আসবে না মফিজদ্দির মনে। সোনার চুড়িপরা অমন সুন্দর তুলতুলে নরম যার হাত, অমন মিঠে যার গলা, চোখ জুড়ানো যার গায়েব রঙ, এমন শক্ত তার মন, কঠিন তার হৃদয় যে স্বামীর অমঙ্গলের ভয় দেখিয়েও নিজের বিশ্বাস থেকে তাকে সে টলাতে পারছে না। গুণিনগিরির উপর তার অবিশ্বাসই যদি না ঘোচানো গেল তাহলে আর গুণের দাম রইল কি মফিজদ্দির। কেবল পাঁচ সিকের পয়সা আর সোয়া সের চালেই কি তার দাম ওঠে, না মন ভরে?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে দেখল মফিজদ্দি কোন্ আজব, অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে মুগ্ধ করতে পারে এই মেয়েটিকে, তার মনের বিশ্বাস আনতে পারে নিজের জারিজুরির ওপর। কিন্তু তেমন কোন শক্তির কথাই তার মনে পড়ল না। না, ম্যাজিকওয়ালাদের মত কোন ক্ষমতাই নেই তার।

না জানে সে তাসের খেলা, না পারে কাগজের টুকরোকে রুপোর টাকা বানাতে, কিংবা ডিমের ভিতর থেকে আস্ত মুরগীর বাচ্চার ডাক শোনাতে। কোন অসাধারণ বিদ্যা তার নেই। তার পড়া লতা হাতে বেঁধে তিন চারজন জ্বরমুক্ত হয়েছে কিন্তু তেইশ চব্বিশ জন ভুগে মরেছে ম্যালেরিয়ায়। তার জলপড়া খেয়ে পেটের অসুখ দুচারজনের সেরেছে কিন্তু সেই সঙ্গে সস্তা দামের হোমিওপ্যাথিক ওষুধও কিনে খেয়েছে তারা। যারা খায়নি তারা রেহাই পায়নি। তার মন্ত্রপড়া শিকড় সুতোয় বেঁধে কোমরে জড়িয়ে একবার করিম শেখের কব্বিলাকে ফুসলিয়ে ঘরের বার করে এনেছিল মোতালেফ; কিন্তু শাড়ি গয়নার লোভ দেখিয়ে কবিলাকে ফের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে করিম। মোকদ্দমা করে জেলে পাঠাবার জো করেছিল মোতালেফকে, হাতে পায়ে ধরে জরিমানা দিয়ে রেহাই পেয়েছে, সবই মফিজদ্দি জানে। নিজের জারিজুরিতে ভিতরে ভিতরে নিজেরই আস্থা প্রায তার নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু যেমন করেই হোক আজ এই সুন্দরী বধূটির কাছে নিজেব মান তাকে রাখতেই হবে। কিছুতেই সে হার স্বীকার করতে পারবে না, হটে যেতে পারবে না এখান থেকে।

হৈমবতী আবার তাগিদ দিলেন, ‘কই বাপু, বললে না তো কি কি লাগবে।’

মফিজদ্দি একটু চমকে উঠল। তারপর তার সেই গূঢ় রহস্যাত্মক গুণিনী হাসি হেসে বলল, ‘সেই কথাই ভাবছিলাম মা, কি বলি আপনাকে। জিনিস-পত্তরের তো বেশি দরকার নেই মা, দরকার ভক্তিছেদ্দার, দরকার বিশ্বাসের। পীরের নামে পাঁচসিকে পয়সা, সোয়া সের চাল, পান সুপুরি এই শুধু আপনার খরচ। আর সরষের তেল দিতে হবে এক বাটি। জিনিস আছে আমার ঝুলির মধ্যে। সেই জিনিস মিশিয়ে মন্তর পড়ে ওই তেল আমি শুদ্ধু করে দেব। কিন্তু মা আর একটি কথা আছে যে।’

হৈমবতী বললেন, ‘কি কথা বলো।’

মফিজদ্দি বলল, ‘কাজ তো আপনার দ্বারা হবে না মা, কাজ করতে হবে কর্তার পরিবারের।’

হৈমবতী বললেন, 'পারবারের।'

মফিজদ্দি বলল, 'হ্যাঁ মা ঠাকরুন, পরিবারকেই এ সব কাজ করতে হয় যে—তাই নিয়ম। মার মতো আপন জন অবশ্য দুনিয়ায় নেই তবু এ সব গুণজ্ঞান তুকতাক পরিবারকে নিজের হাতে করতে হয় ঠাকরুন, নইলে যে ফল ফলে না।'

ফল ফলে না! মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন হৈমবতী। কি নিষ্ঠুর নিয়ম সংসারের। মার তুল্য আপন জন নেই। তবু সন্তানের সব কাজ মাকে দিয়ে চলে না। তার শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গল দেখতে, সুখ দুঃখের ভাগ নিতে আরেকজনকে ডেকে আনতে হয় পরের ঘর থেকে। গুণজ্ঞান তুকতাকের কাজ সঁপে নিতে হয় সেই পরের মেযেব হাতে।

একটু চুপ করে থেকে হৈমবতী বললেন, তাহলে কি করব বলো। মফিজদ্দি বলল, 'বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে আসুন বউঠাকরুনকে। পরিষ্কার ধোয়া রঙিন শাড়ি পরুন তিনি, এলো চুল ছড়িয়ে দিন পিঠের ওপর, ভালো করে তেল সিঁদুর পরুন তারপর এক বাটি সরষের তেল হাতে নিয়ে বসুন এসে গুণিনের সামনে। মন্তর পড়ে শোধন করে দেব সেই তেল। তারপর তা গায়ে মুখে মাখবেন দুজনে। মেখে মুখোমুখি বসে কর্তার জন্য দোয়া মাঙবেন খোদার কাছে, কান্নাকাটি করবেন খোদার দুয়ারে। আপদ বিপদ সব দূর হয়ে যাবে কর্তার। কোন কিছু তাকে আর কাহিল করতে পারবে না।'

হৈমবতী চুপ করে রইলেন। আবার তাঁকে গিয়ে শরণ নিতে হবে তাহলে সেই অবাধ্য পুত্রবধূর যে কিছুই গ্রাহ্য করে না, কিছুই বিশ্বাস করে না।

মফিজদ্দি তাঁর মনের ভাব বুঝে বলল, 'যান মা, গোসা করে থাকবেন না, ডেকে আনুন গিয়ে বউ ঠাকরুনকে। বলুন গিয়ে তাঁর সোয়ামীর কাজ তিনি করবেন না তো কি পাড়ার লোকে এসে করে দেবে? আপনাদের ভদ্রলোকের ঘরে কি এই রীতি? বিপদ আপদ যদি দূর হয় কর্তার, তো লাভ হবে কার? হাসি ফুটবে কার মুখে? তেনার পরিবারের না আর কারো? মান সম্মান নিয়ে যদি তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন তো সুখের

ঢেউ লাগবে কার অন্তরে ? তেনার না পাড়াপড়শীর ? আর যদি অমঙ্গল অঘটন কিছু ঘটে—'

হৈমবতী শিউরে উঠে বললেন, 'চুপ করো ফকির, ওসব কথা মুখে এনোনা। কোন রকম অমঙ্গল ঘটে না যেন আমার বাছার।'

মফিজদ্দি বলল, 'না মা ঘটবেনা। কথার কথা বলছিলাম। কিন্তু গুণিনের কাজ কর্মকে হেনস্তা করলে ফল তার ভাল হয় না মা, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপার, বড় সাংঘাতিক। জেল, ফাঁস কিসে যে কি হয় তা কি বলা যায় মা ঠাকরুন। আইন আদালতের কারবারই আলাদা। সাঁচামিছায় তফাৎ সেখানে ভারি কম। চড়ুইডাঙির নিবারণ বোসের নাম শুনেছেন তো ? ফৌজদাবী মামলায় জেল হয়ে গেল তেনার সাড়ে তিন বছর। কত উকিল, মোক্তার কেউ কিছু করতে পারল না। পারবে কি করে, তেনার পরিবারের এ রকম দেমাক ছিল ঠাকরুন, হেলা হেনস্তা ছিল মনে। অশুদ্ধ কাপড়ে এসেছিল তেল পড়া নিতে।'

হৈমবতী বাধা দিয়ে বললেন, 'ওসব আলোচনা আর কোরোনা ফকির, আমার গা কাঁপে শুনলে। আমি যাচ্ছি, যেমন করে পারি ডেকে আনছি তাকে।'

মফিজদ্দি বলল, 'যান মা যান, বলুন গিয়ে অমন হেলা হেনস্তা ভাল নয় গেরস্তের বউর। তাতে নসিবে এগোয়না।'

হৈমবতী উঠে গেলেন ঘরে। দোরের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল উত্তরা। ফকিরের কথা শুনে মাঝে মাঝে তার হাসি পাচ্ছিল, কখনো বা রাগে জ্বলে যাচ্ছিল গা, ইচ্ছা হচ্ছিল তখনই গিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেয় বারান্দা থেকে।

হৈমবতী কাছে এসে বললেন, 'শুনলে তো সব ?'

উত্তরা বলল, 'শুনলুম কিন্তু আপনি ওসব কিছু বিশ্বাস করবেন না মা। আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য যত সব মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছে ও। ওর কথায় কান দেবেন না। আজও তো চিঠি পেলাম ঠাকুরপোর। ভাল

উকিল দেওয়া হয়েছে তাঁর জন্য। বন্ধুরা সবাই মিলে তাঁর জন্য চেষ্টা করছে। কিছু ভাববেন না আপনি, কোন চিন্তা করবেন না। ওকে বিদায় করে দিয়ে আপনি এবার খেতে আসুন।'

কিন্তু হৈমবতী যেন সে সব কথা শুনেও শুনলেন না। এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উত্তরার দিকে তারপর বললেন, 'বউমা, তোমার জন্য আমি কি শেষে মাথা খুঁড়ে মরব? সুব্রতের মঙ্গল অমঙ্গল কিছু নয়, তোমার জেদটাই সব চেয়ে বড়? আমি তোমার হাতে ধরে বলছি বউমা, আমার কথা শোন, আমার কথা শোন ভালো হবে, মঙ্গল হবে তোমার।' বলতে বলতে হৈমবতীর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল।

মুহূর্তকাল সেইদিকে তাকিয়ে রইল উত্তরা তারপর স্নিগ্ধ আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'আপনি গিয়ে বসুন মা। আমি ফকিরের কথামত তৈরী হয়ে আসছি।'

মিনিট কয়েক বাদে তেলের বাটি হাতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল উত্তরা। ফকির উৎফুল্ল চোখে তার দিকে তাকাল। জয় হয়েছে মফিজদ্দির। তার কথা তা হলে মেনেছে উত্তরা। ধারণাতীত আশাতীত তার এই বশ্যতা। ভিজে চুলের রাশ দেখা যাচ্ছে আঁচলের ফাঁকে। গাঢ় লাল রঙের শাড়ি পরেছে নতুন বউয়ের মত। খাটো ঘোমটার আড়ালে আড়চোখে একবার তাকাল মফিজদ্দি। গৌরবর্ণ সুন্দর ছোট কপালে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুরের ফোঁটা। চোখ দুটি আনত হয়েছে লজ্জায়। ভারি খাপসুরৎ খোদার সৃষ্টি। মফিজদ্দির নির্দেশমত কাঁকন পরা দুখানি হাতে তেলভরা বাটি এগিয়ে ধরল উত্তরা। ঝুলি থেকে কাগজে মোড়া খানিকটা শাদা গুঁড়ো বের করে মফিজদ্দি সেই তেলের মধ্যে ছড়িয়ে দিল তারপর ফুঁ দিতে লাগল মন্ত্র পড়ে পড়ে।

দোরের ফাঁকে একখানি হাতে কেবল একটু আভাস এসেছিল। এবার শাঁখা বাঁধান অলঙ্কৃত দুখানি হাতই সম্পূর্ণভাবে তার দিকে মেলে ধরেছে উত্তরা। কিন্তু সেই হাতের দিকে আর তাকাল না মফিজদ্দি। এই মেয়েটির চোখে নিজেকে সে ছোট করতে পারবে না, নিজের কৃতিত্বকে সে উজ্জ্বল

করে তুলবে। তেলে কানায় কানায় ভরেছে বাটি। তার ওপর চোখ রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মন্ত্র আউড়ে যেতে লাগল। মফিজদ্দি এমন মন দিয়ে জীবনে কোন দিন মন্ত্র পড়েনি। এমন তন্ময়তার স্বাদ কোন দিন যেন সে অনুভব করেনি জীবনে।

মন্ত্রপড়া শেষ হয়ে গেলে একান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে মফিজদ্দি বলল, 'যান ঠাকরুন ঘরে যান, হয়ে গেছে কাজ।'

তারপর হৈমবতীর দিকে চেয়ে বলল, 'ঘরে যান মাঠাকরুন। খোদার নাম করুন গিয়ে। খোদা সবাইকে শান্তিতে রাখুন, দোয়া করুন সবাইকে।'

ডালায় করে চাল ডাল পান সুপুরি আর পাঁচ সিকে দক্ষিণা হৈমবতী এনে দিলেন ফকিরকে, বললেন, 'আমাদের কল্যাণে তুমিও একটু ডেকো খোদাকে।'

মফিজদ্দি বলল, 'ডাকব বই কি মাঠাকরুন, এখুনি গিয়ে ডাকব।'

খানিকবাদে বার বাড়ির পুকুরের ঘাটে শাশুড়ীর এঁটোবাসন ধুতে গিয়ে উত্তরা দেখতে পেল বড় আমলকি গাছটির ছায়ায় পশ্চিম দিকে মুখ করে একাগ্র মনে নামাজ পড়ছে মফিজদ্দি। বাসনের পাঁজা হাতে নিয়ে সেই দিকে উত্তরা অপলকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, নামাজ পড়বার ভঙ্গীটুকু ভারি সুন্দর লাগল চোখে। মনে পড়ল খানিক আগে যখন তন্ময় হয়ে তেলের বাটির দিকে চেয়ে মন্ত্র পড়ছিল ফকির তখনো বেশ দেখাচ্ছিল তাকে।

নামাজ শেষ করে মফিজদ্দি দোয়া প্রার্থনা করতে লাগল খোদার। 'আমার মন্তরের তো কোন গুণ নেই খোদা, গুণ তোমার নামের। সেই নামের গুণে গুণিন আমি, খাঁটি কর সেই গুণিনগিরি। দোয়া কর এই ঠাকরুনের সোয়ামীকে, বিপদ আপদ থেকে রেহাই দাও তারে, আমার গুণিনগিরির মান রাখো।'

সমস্ত দেহ মনে অদ্ভুত এক আনন্দের স্বাদ অনুভব করল মফিজদ্দি। কোনদিন কোন উপলক্ষ্যে এমন করে খোদাকে কারো জন্য সে আর ডাকেনি, বুঝি নিজের জন্যও নয়।

চা

লিণ্টন স্ট্রীটের মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল শুভেন্দু, একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। নীলিমা বাস থেকে নেমে গলির মধ্যে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়েছে, শুভেন্দুকে দেখে থেমে দাঁড়াল, বলল, 'তুমি !'

শুভেন্দু ওই একটি শব্দেরই প্রতিধ্বনি করল, 'তুমি !'

তারপর বলল, 'কতকাল পরে দেখা।'

নীলিমা বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কোন না কোন দিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটাও থাকে।'

শুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার পরনে কমদামী শাদা খোলের একখানা মিলের শাড়ি, মণিবন্ধে দুগাছা সরু চুড়ি ছাড়া সারা দেহে আর কোন আভরণ নেই। বাঁ হাতে স্কুলপাঠ্য একখানা ইতিহাসের বই, আর তার তলায় এক রাশ খাতা। শরীর ভারি রোগা হয়ে গেছে, সেই আগের মত চেহারা আর নেই। কিন্তু সিঁথিটি আগের মতই শাদা রয়েছে। নীলিমা লক্ষ্য করল শুভেন্দুর পরনে দামী স্যুট। আঙ্গুলে পাথর বসানো দুটি আংটি, একটির রঙ নীল, আর একটি গাঢ় রক্তবর্ণ, আগের চেয়ে বেশ একটু মোটা হয়েছে দেখতে।

শুভেন্দু বলল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছ ?'

নীলিমা বলল, 'স্কুলে। নোনাপুকুর বিদ্যাপীঠে মাষ্টারি করি। তুমি যাচ্ছ কোথায়, কোন অফিসে ? না কি চাকরি বাকরি আর করতে হয় না।'

শুভেন্দু বলল, 'বাঃ, চাকরি করতে হয় বৈ কি, চাকরি না করলে খাব কি। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে কাজ করি।'

নীলিমা বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে বড় চাকুরে।' শুভেন্দু বলল, 'কিন্তু আসলে বড় চাকর।'

নীলিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে করেছ তো ?'

শুভেন্দু একটু ঢোক গিলে বলল, 'রাম বল। বিয়ে করবার আর সময় পেলাম কই।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম···।'

শুভেন্দু একটু হাসল, 'সে তো আমিও শুনেছিলাম তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু দেখছি তো অন্যরকম। দেখার সঙ্গে কি সব সময় শোনার মিল হয় ?'

নীলিমা বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা চলি।'

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি, এতদিন পরে দেখা। কথাবার্তা কিছুই হোল না এরই মধ্যে বিদায় নিচ্ছ।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু স্কুলের বেলা হয়ে গেল যে। অমনিতেই আজ একটু লেট হয়েছি, কটা বাজল, এগারটা বেজে গেছে বোধ হয়।'

শুভেন্দু হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সোয়া এগার। শোন, আজ আর তোমার স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, আমিও অফিস কামাই করব, এসো গাড়িতে।'

নীলিমা বলল, 'তারপর।'

শুভেন্দু বলল, 'তারপর আর কি। সারাদিন ছুটে বেড়াব আর মাঝে মাঝে চা খাব। মনে আছে সেই চা খাওয়ার কথা ?'

নীলিমা মৃদু হেসে বলল, 'আছে। কিন্তু স্কুল আমার আজ কামাই করবার জো নেই, জরুরী দরকার।' আজ মাইনের তারিখ, সে কথাটা আর নীলিমা খুলে বলল না। বলল, 'বরং আমাদের বাড়িতে এসো। শুভেন্দু বলল, 'বেশ, কবে যাব বল।'

নীলিমা বলল, 'কালই এসো সন্ধ্যার পর। বেদিয়া ডাঙা সেকেণ্ড লেন, তেত্রিশ নম্বর বাসে উঠে বণ্ডেল গেটের কাছে নামবে, তারপর রেল লাইন ক্রশ করে,—ওমা তোমার তো গাড়িই আছে।' বেশ একটু অপ্রস্তুত হলো নীলিমা।

শুভেন্দু বলল, 'যা ভেবেছ তা নয়, অফিসের গাড়ি। অফিসের কাজেই এদিকে এসেছিলাম। সব পরের ধনে পোদ্দারি।'

নীলিমা বলল 'আচ্ছা, কাল তা হলে সত্যিই আসছ তো।'

শুভেন্দু বলল, 'নিশ্চয়ই।' তারপব পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল নীলিমা। যতক্ষণ দেখা যায় শুভেন্দু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ বাস চেহারা দেখে বোঝা যায় অভাবে পড়েছে। সেই আগের দিন আর নেই। কিন্তু দেহের সেই সুন্দর গডন এখনো যেন প্রায় তেমনি আছে। শ্যামবর্ণেব ওপব ছিপছিপে দোহারা চেহারা। বড বড কালো দুটি চোখে রহস্য যেন আরো গভীব হয়েছে।

গাডিতে ষ্টার্ট দিল শুভেন্দু। ম্যাঙ্গো লেনে অফিসে গিয়ে পৌছল। কিন্তু কাজ কর্মে মন লাগল না। আট নয় বছব আগের একটি মফঃস্বল শহর আর কয়েকটি টুকরো টুকবো ছবি ওব চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল, আর সব ছবিব সঙ্গে জডিয়ে রইল একটি মেয়ে। ষোল সতের বছর তার বয়স, যেমন চঞ্চল তেমনি প্রগলভ।

কাছারি বাডির ঝাউগাছের সাবিব পিছনে লাল সুডকির পথ। আর সেই পথের প্রান্তে দোতলা হলদে বঙের বাডি। এই বাডিটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শুভেন্দুবই এক দূর সম্পর্কের দাদা শিবতোষ। শহবের ফার্ষ্ট মুন্সেফ ভবেশ দত্ত শিবুদার মাসশ্বশুর। দূর থেকে একদিন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন শিবুদা, তারপর একদিন কলেজ ছুটির পরে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'আয, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পরিচয় কর। আজকালকার দিনে এত কুনো, মুখচোবা হয়ে থাকলে চলে নাকি দুনিয়ায় ?'

তখন ভারি মুখচোরা স্বভাবই ছিল শুভেন্দুর। দু বছর এই শহরে থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করেছে বটে কিন্তু দু একজন প্রফেসর আর ক্লাসের দু চারটি ছাত্র ছাড়া কারও সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয় নি। কলেজ হোষ্টেলে তিন সীটওয়ালা একটি ঘবে কোণের দিকের একখানা তক্তপোশে সে থাকে, কারো সঙ্গে বড় একটা মেশে না, ইচ্ছা সত্ত্বেও মিশতে পারেনা। এই

নিয়ে সহপাঠী সহকর্মীরা নানা রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। কেউ বলে দেমাকী, কেউ মুখ বাঁকিয়ে বলে গেঁয়ো ভূত। শুভেন্দু বইয়ের আড়ালে চোখ ঢাকে। তাদের মুখভঙ্গীর দিকে তাকায় না, বক্রোক্তির সময় বধির সাজে।

এমনি করেই চলছিল। শিবুদা কলকাতা থেকে গাঁয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে খুলনায় দুদিন রয়ে গেলেন। আর সেবারই পরিচয় করিয়ে দিলেন ভবেশ বাবুদের সঙ্গে। বেশ শিক্ষিত সম্পন্ন পরিবার। বড় ছেলে কলকাতায় থেকে ল পড়ে। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সেজোটি ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভরতি হয়েছে, তার পরেই সব ফ্রক আর হাফ প্যাণ্টের দল।

এই বাড়িতে প্রথম দিন এসেই বড় অপ্রস্তুত হয়েছিল শুভেন্দু। শিবুদা শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছেলেটি পড়াশুনায় বেশ ভালো, কিন্তু বড্ড লাজুক।' শিবুদার মাসী শাশুড়ী বললেন, 'লাজুকই ভালো বাবা, যে ফাজিল ফক্কর ছেলেমেয়ে হয়েছে আজকাল। এদের মধ্যে শান্ত সৌম্য কাউকে দেখলে আমার তো চোখ জুড়ায়, তোমরা যে যাই বল।'

বারান্দায় বেতের টেবিল চেয়ার পেতে সান্ধ্য চায়ের আয়োজন হচ্ছিল। সেখানে ডাক পড়ল শিবতোষ আর শুভেন্দুর। প্লেটে করে ডিমের তৈরী দু তিন রকমের খাবার এগিয়ে দিয়ে বড় একটা কেটলি থেকে প্রত্যেকের কাপে চা ঢেলে দিচ্ছিল নীলিমা। খানিক আগে শিবুদা তাঁর এই তরুণ শ্যালিকাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, নমস্কার বিনিময় ছাড়া বাক বিনিময় তখনো হয়নি, কিন্তু তার কাপে চা ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু বলে উঠল, 'আমি তো চা খাইনে।'

নীলিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল, 'খান না! ঢেলেছি যখন একটু খান।' কথাবার্তায় ভারি সপ্রতিভ নীলিমা। যেন শুভেন্দুর সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয়। শিবুদা হেসে বললেন, 'তবেই হয়েছে, শুভেন্দু আমাদের এযুগের ঋষ্যশৃঙ্গ, এত বড় হলে হবে কি পান সিগারেট চা কোন দিন মুখে তোলেনি। এসব ব্যাপারে রাঙা কাকার ভারি কড়া শাসন।'

নীলিমা বলল, 'তা থাকুক গিয়ে, পান সিগারেটের সঙ্গে চায়ের তুলনা

দেবেন না জামাইবাবু, চা-টা পান সিগারেটের মত ন্যাষ্টি নয়। অনেক ভালো, অনেক সুন্দর।'

নীলিমার মা হেসে বললেন, 'তাতো হবেই, যা একটি চায়ের পোকা তুমি, দুধের চেয়েও তোমার কাছে চা ভালো।' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা দেখছি তোমার এই মেয়ের জন্যে কোন চা বাগানের ম্যানেজার ট্যানেজার খুঁজতে হবে।'

ভবেশবাবু ভারি মিতভাষী। স্মিত মুখে বললেন 'হুঁ'। শ্বেতপদ্মের মত চমৎকার কাপটি। তার মধ্যে কানায় কানায় ভরা তাম্রাভ পানীয়, দেখে দেখে ভারি লোভ হলো শুভেন্দুর। একবার তাকাল নীলিমার দিকে তারপর নিচু হয়ে আচমকা কাপে চুমুক দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলো শুভেন্দু, তরল পানীয়ের উত্তাপে ঠোঁট দুটি যেন পুড়ে গেছে।

নীলিমা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, চোখাচোখি হওয়ায় মুখে আঁচল চাপা দিল, তবুও কি সুস্থ থাকবার জো আছে। ভিতর থেকে প্রবল এক হাসির বেগ ওর সমস্ত শরীরকে আন্দোলিত করছে। শেষ পর্যন্ত পরিবেশন বন্ধ রেখে ছুটে চলে গেল ঘরে। জানলা দিয়ে শুভেন্দুর চোখে পড়ল তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ে তখনো নীলিমা হাসির গমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে একা নয়, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সেই প্যাণ্টফ্রকের দল। নীলিমার মাও অতি কষ্টে হাসি চেপে বললেন, 'মুখপুড়ীর কাণ্ড দেখ।'

ভবেশ বাবু মেয়ের উদ্দেশে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'না না এসব কি, বয়স তো কম হয় নি, এখনো যদি ম্যানার্স না শেখে'—

নীলিমার মা বললেন, 'চা যখন তোমার খাওয়া অভ্যাস নেই তখন আর খেয়ে কাজ নেই বাবা। আমি তোমার জন্য সরবৎ করে আনছি।' শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না আমার আর কিছু দরকার নেই।'

এত অপ্রস্তুত আর নাকাল শুভেন্দু জীবনে হয় নি। বাইরে এসে শিবুদাও বললেন, 'তুই একটি আস্ত উজবুক, একটা সিন ক্রিয়েট করে ছাড়লি তো?'

দিন দুই পরে কলেজে ঢুকতে যাচ্ছে পিছন থেকে ডাক শুনল, 'শুনুন।'

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল আরো দু তিনটি মেয়ের সঙ্গে নীলিমাও বেরোচ্ছে। তখন কলেজে সকালে মেয়েদের ক্লাস হোত দুপুরে ছেলেদের।

শুভেন্দু ওর দিকে তাকাতে নীলিমা বলল, 'জামাইবাবু কি চলে গেছেন?'

শুভেন্দু জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

ইশারায় সঙ্গিনীদের এগুতে বলে নীলিমা শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিনের ব্যবহারের জন্য বড়ই লজ্জিত হচ্ছি। মা যেতে বলেছেন আপনাকে। তাঁর কাছে খুব বকুনি খেয়েছি। আপনি না গেলে আরো বকবেন।'

শুভেন্দু বলল, 'আমার তো সময় হবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সময় হোল। তারপর ঘন ঘনই যাতায়াত শুরু করল শুভেন্দু।

লজিকটা মাথায় ঢোকেনা নীলিমার। এদিকে শুভেন্দু লেটার পেয়েছে ন্যায়শাস্ত্রে। নীলিমা বলল, 'মা, শুভেন্দুদা যদি মাঝে মাঝে আমাকে লজিকটা দেখিয়ে দেন খুব সুবিধে হয়।'

নীলিমার মা বললেন, 'বেশ তো, ওর যদি পড়াশুনোর কোন ক্ষতি না হয়—'

শুভেন্দুর আপত্তি দেখা গেল না। সে নীলিমাকে লজিক শেখাতে লাগল, আর নীলিমা তাকে চা খাওয়ায় রপ্ত করে তুলল। প্রথম প্রথম অবশ্য চা দিত না নীলিমা। বলত, 'কি দরকার পরের ছেলেকে হনুমান বানিয়ে। ঠাণ্ডা ছেলের পক্ষে সরবতই ভালো।' কিন্তু দিন কয়েক পরেই সরবতের গ্লাসের বদলে চায়ের কাপ জায়গা দখল করল। আর শুভেন্দুর সমস্ত হৃদয় দখল করল এই শ্যামলা চা দাত্রীটি? ন্যায়শাস্ত্রের বিধি রক্ষিত হোল কি না বলা যায় না, কিন্তু যা লজিক্যাল তাই ঘটল।

নাটক পঞ্চমাঙ্কে গিয়ে পৌঁছবার আগেই ভবেশবাবু চাটগায়ে বদলী হয়ে গেলেন। নীলিমা আর শুভেন্দু অনেক মতলব আঁটল। একবার ভাবল কাউকে না বলে দুজনে মিলে পালায় আর একবার ভাবল সোজাসুজি বাবা মাকে বলে। কিন্তু কাজে কিছুই হলো না। চরম কোন পথ নেওয়া কারোরই সাহসে কুলিয়ে উঠল না। তা ছাড়া বি এ. পরীক্ষার চাপ তখন

শুভেন্দুর ঘাড়ে। বেশি হৈ চৈ করবার মত অবস্থা তখন নয়। বিদায়ের সময় সজল চোখে নীলিমা বলল, 'চিঠি দিয়ো।'

আর্দ্রগলায় শুভেন্দু প্রতিধ্বনি করল, 'চিঠি দিয়ো।'

চিঠির আদান প্রদান অনেক দিন পর্যন্ত চলেছিল।

তারপর একসময় স্বাভাবিক নিয়মেই তা বন্ধ হয়ে গেল। সাড়া এল না নীলিমার কাছ থেকে। শুভেন্দু শুনতে পেল ওর বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম খুবই আঘাত লেগেছিল। মনে হয়েছিল এই দাগ, এই ক্ষত চিহ্ন বুঝি কোনদিন মিলাবে না, এই শূন্যতা কোনদিন ভরে উঠবে না। কিন্তু জীবনের নিয়ম অন্যরকম। সেই নিয়মে শুভেন্দু পড়াশুনোর পাট শেষ করে চাকরি সংগ্রহ করল। বাবার অনুরোধে বিয়েও করল। নীলিমার স্মৃতি প্রায় মুছে গেল মন থেকে, কিন্তু চায়ের অভ্যাসটি গেল না। বরং চা রসিক হিসাবে বন্ধু মহলে শুভেন্দুর বেশ খ্যাতি বেড়ে উঠল। চা শুধু খায়ই না শুভেন্দু, বন্ধু বান্ধবকে ডেকে খাওয়ায়ও। সবাই বলে, চায়ের এমন স্বাদ এমন সৌরভ আর কারো বাড়িতে মেলে না। অবশ্য এ কৃতিত্ব শুধু শুভেন্দুর একার নয়, তার স্ত্রী মানসীও এর অর্ধাংশ ভাগিনী।

লাঞ্চের সময় অফিসের বেয়ারা অন্য খাবারের সঙ্গে চাও নিয়ে এল। সেই তরল পানীয়ের মধ্যে পুরনো দিনের অনেক প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল শুভেন্দু। কতদিন যে কত জায়গায় নীলিমার সঙ্গে সে চা খেয়েছে তার্ ঠিক নেই। কখনো বাগানে, কখনো ছাদের কোণে, কখনো দুপুর রোদে, কখনো বৃষ্টির সময় জানলাটির ধারে বসে দুজনে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে গল্প করেছে। সেই অতীত দিনের মধুর দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ইচ্ছে হোল আজ নীলিমার ওখানে গিয়ে চা খেলে কেমন হয়! নিমন্ত্রণ অবশ্য কাল, কিন্তু একদিন আগে গিয়ে ওকে অবাক করে দেবে।

অফিসের ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে গেল শুভেন্দু। সিমলা স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাট নিয়ে ওরা থাকে। ফেরা মাত্র তিন বছরের ছেলে এসে জড়িয়ে ধরল, 'বাবা আমার জন্যে কি এনেছ।' কিন্তু শুভেন্দু আজ বড়

অন্যমনস্ক। মানসীও এগিয়ে এসে বলল, 'আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরেছ।'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, এক্ষুণি আবাব বেরোতে হবে।' অফিসের পোশাক ছেড়ে সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরল শুভেন্দু। মনে মনে আগেই ঠিক করেছিল জমকালো বেশে নীলিমার ওখানে যাবেনা, আটপৌরে সাধারণ বেশে গিয়েই উপস্থিত হবে, যেন নীলিমার অবস্থার সঙ্গে ওকে মানায়।

মানসী জিজ্ঞেস করল, 'এত কি তাড়া, চা খেয়ে যাবে না?'

শুভেন্দু বলল, 'না, সময় হবে না। জরুরী দরকার আছে।' আজ নীলিমার ওখানে গিয়ে প্রথম সান্ধ্য চা খাবে ঠিক করেছে শুভেন্দু।

গাড়ি নিল না, হেঁটে গিয়ে ট্রাম ধরল। সার্কুলার রোডে পড়ে তেত্রিশ নম্বরের বাস ধরল শুভেন্দু। নীলিমা যে বাসে রোজ যাতায়াত করে সেই বাসে। গাড়িতে অত্যন্ত ভিড়, সারাটা রাস্তা প্রায় দাঁড়িয়ে যেতে হোল তবু মনে মনে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যও অনুভব করল শুভেন্দু। যেন দুর্গম পথে অভিসারে বেরিয়েছে।

বাস থেকে নেমে নীলিমার দেওয়া ঠিকানা ধবে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল শুভেন্দু। শহরের একেবাবে বাইরে জন-মানবহীন অন্ধকার জীর্ণ একটা পোড়ো বাড়িব সামনে এসে থামতে হোল ওকে। কড়া নাডতে একটা হ্যারিকেন হাতে নীলিমা এসে সামনে দাঁডাল। বিস্মিত হয়ে বলল 'তুমি! তোমার না কাল আসবাব কথা ছিল!'

শুভেন্দু বলল, 'কালকের সন্ধ্যার চেয়ে আজকের সন্ধ্যা অনেক কাছে।'

নীলিমা বলল, 'এসো, আমিও এই একটু আগে ফিরলাম।' এত দেরি করে কেন ফিরল সে কথাটা অবশ্য আর নীলিমা জানাল না। স্কুলের মাইনে আজ হয় নি, প্রতিবেশীর কাছে গোটা পাচেক টাকা ধারের চেষ্টায় বেরিয়েছিল পায় নি। নীলিমা বলল, 'এসো যা বাড়ি ঘরের অবস্থা তোমার ভারি কষ্ট হবে।'

শুভেন্দু বলল, 'কষ্ট তো তোমারও হচ্ছে। কিন্তু এভাবে অজ্ঞাতবাস করে লাভ কি।'

নীলিমা বলল, 'তোমার কি ধারণা ইচ্ছা করে অজ্ঞাতবাস করছি। করতে বাধ্য হচ্ছি, এসো।'

ভিতরের একখানা ঘরে গিয়ে নীলিমা শুভেন্দুকে বসতে দিল। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট তক্তপোশ, তাতে ছেঁড়া একটা সতরঞ্চি পাতা। নীলিমা বলল, 'দাঁড়াও, বিছানার চাদরটা পেতে দিই।'

শুভেন্দু সেই ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে বলল, 'থাক থাক, আর চাদরের দরকার নেই। তারপর খবর টবর বল। বাড়ির আর সব কোথায়।'

নীলিমা সংক্ষেপে তাদের পারিবারিক দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিল। বহু টাকা দেনা রেখে বাবা মারা গেছেন, মাও আজ বছর তিনেক হল নেই। দাদা টি. বি হাসপাতালে। অসুখের আগে বিয়ে করেছিলেন, দুটি ছেলে মেয়েও হয়েছে। তাদের ভরণ পোষণের ভার নীলিমার ওপর। আগের দিন চেতলা থেকে বউদির কাকা এসে সবাইকে নিয়ে গেছেন। তার খুড়তুতো বোনের বিয়ে।

এসব কথা সেরে নীলিমা একটু ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু এমন দিনেই এলে তোমাকে যে কিছু আনিয়ে দেব তারও জো নেই, কোন দোকানপাট নেই ধারে কাছে, এমনি পাড়া।'

শুভেন্দু বলল, 'হয়েছে। তোমার আর ভদ্রতা করতে হবে না। দিতেই যদি হয় এক কাপ চা দাও।'

নীলিমা বলল, 'চা।'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, চা খেতেই তো এলাম।'

হ্যারিকেনের ম্লান আলোতেও শুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার মুখের রঙ বদলেছে। চায়ের প্রসঙ্গে, চায়ের অনুষঙ্গে রঙ লেগেছে দুনিয়ায়।

নীলিমা বলল, 'বোসো, আসছি।'

নিস্তব্ধ পাড়া, নির্জন ঘর। বাইরে রাত্রির অন্ধকার। শুভেন্দু মনে মনে ভাবল বহুদিন পরে চা খাওয়ার এক নতুন পরিবেশ জুটেছে। মুখোমুখি বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নীলিমাকে যদি আজ জিজ্ঞেস করে শুভেন্দু,

'নীলি, সেই দিনগুলি কি একেবারেই গেছে, তাদের কি আর একটি বারের জন্যও ফিরিয়ে আনা যায় না ?' তা হলে কি খুব অন্যায় হবে ?

একটু বাদে এক কাপ চা এনে নীলিমা শুভেন্দুর হাতে তুলে দিল। আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া লাগল দুজনের।

শুভেন্দু বলল, 'তোমার চা।'

'আনছি।'

বলে নিজের চায়ের কাপটিও নিয়ে এসে সামনে বসল নীলিমা। সেই আগেকার দিন যেন ফিরে এসেছে। বলল, 'শুধু চা-ই কিন্তু দিচ্ছি।'

শুভেন্দু বলল, 'শুধু চা-ই দাওনি, তা তুমি নিজেও জানো।' বলে আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিল শুভেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই প্রথম দিনের মতই মুখ বিকৃত করে কাপটি তক্তপোশের উপর নামিযে রাখল। অতি বিশ্রী একটা গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উল্টে আসছে। এত বাজে চা জীবনে শুভেন্দু মুখে দেয় নি।

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হলো।'

'না কিছু হয় নি।' বলে কাপটি আর একবার হাত বাড়িয়ে নিতে গেল শুভেন্দু। কিন্তু মনের যতখানি উৎসাহ আছে অবাধ্য হাতের যেন ততখানি আগ্রহ নেই। নীলিমা ততক্ষণে সব টের পেয়েছে। বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, এ চা তুমি খেতে পারবে না, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

এই দ্বিতীয় বার অপ্রস্তুত হোল শুভেন্দু। ওর মুখে আজও কোন কথা ফুটল না। শুভেন্দুর ইচ্ছা করতে লাগল সেদিনের মত নীলিমা আজও ওর সমস্ত অপটুতা হেসে উড়িয়ে দেয়, সেদিনের মত উচ্ছল হাসির ঢেউয়ে সমস্ত ব্যবধান, অভ্যাস আর অনভ্যাসের সমস্ত বৈষম্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তা হলোনা। নীলিমার মুখে আজ আর হাসির লেশ মাত্র নেই। ক্ষমাহীন কঠিন চোয়ালে সে মুখ যেন আর নীলিমার নয় অন্য কোন অপরিচিতার।

বাইরে ঘন জমাট অন্ধকার। আর সেই দীর্ঘ বিশ্রী পথ, দুদিকে কাঁচা চামড়া আর নর্দমার গন্ধ। শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হোল এসব পার হয়ে কতক্ষণে একটি স্বাদু সুরভিত চায়ের কাপ সে মুখে তুলতে পারবে। অনেকক্ষণ সে চা খায় নি।

পরিচালক

রূপছায়া পিক্চার্সের সঙ্গে আমার একটি বইয়ের কনট্রাকট হওয়ার প্রায় একমাস পরে হরগোপাল বিশ্বাস একদিন সকাল বেলায় আমার বাসায় এলেন। আমি তখন লিণ্টন স্ট্রীটের একটি বস্তিতে থাকি। রাস্তার দিকে বাইরের ঘরটিতে বসে নতুন গল্পের তরুণী নায়িকার রূপ কল্পনা করছি, দরজার কড়া নড়ে উঠল। গল্পটা আসি আসি করছিল, এই সময়ে বাধা পেয়ে আমি একটু বিরক্ত হলাম। উঠে গিয়ে দোর খুলে দেখি এক অপরিচিত আগন্তুক। বয়স পঞ্চান্নর কম হবে না। বরং একটু বেশিই দেখায়। পরনে সস্তা স্যুট। মাথায় একটা টুপিও আছে। হাতে সিগারেট। পোশাক থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যে একটি অপরিচ্ছন্ন ভাব। পোশাক সম্বন্ধে আমার কোন গোঁড়ামি নেই। ওটা যে জাতীয় হতেই হবে, এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনে। ধুতি, লুঙ্গি, পাজামা, প্যাণ্ট আমি সবই সমর্থন করি। তবে সেই সঙ্গে স্থান কাল পাত্র ভেদটা মানি। যে কোন কারণেই হোক আমার সেদিন মনে হল এই জীর্ণ বিদেশী বেশ দেশী মানুষটিকে ঠিক মানাচ্ছে না। এর চেয়ে ধুতি পাঞ্জাবি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে একটু স্নিগ্ধতা দিত। দারিদ্র্যকে এমন প্রকট করে তুলত না। কারণ বৃটিশ যুগে আমাদের ধারণা রয়ে গেছে যে সাহেব মানেই বড়সাহেব, তাতো এত অল্পদিনেই যাওয়ার নয়। ওঁর হাতের সিগারেটের ধোঁয়া আমার নাকে যাচ্ছিল। তাতেও আমি প্রীত বোধ করলাম না। ভ্রূ কুঁচকে বললাম, 'কি চাই ?'

তিনি বললেন, 'গুড মর্ণিং স্যার। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামই কি কল্যাণ কুমার রায় ?'

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কি চাই আপনার ?'

ভদ্রলোক তাঁর কালো দাঁতগুলি বার করে একটু হেসে বললেন, 'বলছি।

যাক সত্যি সত্যিই তাহলে আপনার ঠিকানা খুঁজে পেলাম। আজকের সকালে এ একটা এ্যাচিভমেণ্ট বলতে হবে। মশাই, কি ঘোরাটাই ঘুরেছি আপনি ভাবতে পারবেন না। কেউ বলতে পারে না, কেউ চেনেনা আপনাকে। একটা বস্তি বাড়ির ঠিকানা খুঁজে পাওয়া কি একজন নতুন লোকের পক্ষে সোজা? কিন্তু আমার টেনাসিটি আছে। আমি অল্পেতে দমে যাওয়ার মত লোক নই।'

আমি বললাম, 'ভিতরে এসে বস্থন। আপনার পরিচয়টা তো জানা হল না।'

ভদ্রলোক রহস্য-ঘন ভঙ্গীতে একটু হাসলেন, তারপর আমার পরিত্যক্ত চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাতে নিঃসংকোচে বসে পড়ে পরম অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, 'আমি আপনার ডিরেক্টর।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ডিরেক্টর মানে'?

'ডিরেক্টর মানে আপনার গল্পের ডিরেক্টর। আমার নাম হরগোপাল বিশ্বাস। আমি রূপছায়া কোম্পানিতে অনেকদিন ধরে আছি। 'দ্বিধা' গল্পটির লেখক তো আপনিই?'

আমি বললাম, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ও গল্পটার ডিরেকসন তো অন্য কেউ দেবেন শুনেছিলাম।'

আমি বিখ্যাত ডিরেক্টরদের নাম আর ওঁর সামনে করলাম না। শত হলেও পেশাগত ঈর্ষা থাকা স্বাভাবিক।

হরগোপালবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকেই চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিঃ সেহানবীশ আমাকেই দিলেন বইটা। আমার এই প্রথম বই। খেটে-খুটে যত্ন নিয়ে করব। আমি আরো পাঁচটা বইয়ের সঙ্গে দায়সারা কাজ করবনা মশাই। মিঃ সেহানবীশ তা বোঝেন।'

আমি খুব উৎসাহ বোধ করলাম না। তাঁরও প্রথম আমারও প্রথম। প্রথমে প্রথমে একেবারে শেষ না হয়ে যাই।

আমার মনের ভাব অনুমান করতে পেরে হরগোপালবাবু তাঁর যোগ্যতার

নানারকম প্রমাণ দিতে লাগলেন। তাঁর নাম আমি না শুনতে পারি। আমার নাম ও তো তিনি এর আগে শোনেননি। তাতে কিছু এসে যায় না। মানুষের পরিচয় নামে নয় কাজে। ক্যামেরার কাজে তাঁর দক্ষতার কথা সবাই স্বীকার করে। তা ছাড়া ট্রেডের যে কোন লোক তাঁর নাম জানে। আমি একটু খোঁজ নিলেই তা টের পাব। তিনি আরো বললেন অন্য কোন ডিরেক্টর হলে অযাচিত ভাবে লেখকের সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করতে আসতেন না। লেখকের ধারই তারা ধারতেন না।—আমার গল্প নিয়ে তাঁরা অন্য গল্প বানাতেন। কিন্তু হরগোপালবাবু তা করবেন না। সাধ্বী স্ত্রীর মতো তিনি আমার ওপর বিশ্বস্ত থাকবেন।

শেষ পর্যন্ত আমি খুশিই হলাম। স্ত্রীকে ডেকে বললাম, 'ভালো করে চা-টা কর। শুধু চা না খাবার টাবারও আনিয়ে নাও।' ছোট ভাইকে ডেকে বললাম, 'যা ভালো দেখে সিগারেট নিয়ে আয়।'

আদর আপ্যায়ন করা দরকার। চিত্রজগতে ডিরেক্টরও যা ডিকটেটরও তাই।

খেতে খেতে ভদ্রলোক আমার গল্পটা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। বিধবা বিয়ে নিয়ে গল্প। একটি তরুণী বিধবার বালক পুত্রের সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রেমের সঙ্গে বাৎসল্যের বিরোধ।

হরগোপালবাবু বললেন, 'বড় শক্ত বিষয় মশাই। লোকে কতখানি নেবে, কতখানি নেবেনা বলা যায় না। প্রডিউসার তো গল্প পছন্দ করেই খালাস। তারপর যত ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয় ডিরেক্টরকে। আর এক কথা। আপনার এই আট পাতার গল্প। একে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বার হাজার ফুটে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সোজা কাজ মশাই ?'

আমি স্বীকার করলাম কাজটা সহজ নয়।

তিনি বললেন, 'আপনার সাহায্য চাই। আপনাকে ছাড়া আমি এক পাও এগোব না।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আমাকে যখন ডাকবেন তখনই যাব।'

তারপর চিত্রনাট্য রচনার কাজ শুরু হল। তিনি ও তাঁর সহকারী সুধাময় গুপ্ত আসতে লাগলেন। আমি নতুন গল্প লেখা ফেলে রেখে লেখা গল্পকে কি ভাবে টেনে বাড়ানো যায়, গল্পকে নাটক এবং নাটককে কি ভাবে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করা যায় সেই চিন্তায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলাম।

বৈঠক শুধু আমাদের বাসাতেই বসত না। প্রডিউসারের প্রাসাদে আমরা নিমন্ত্রিত হলাম। কারণ হরগোপালবাবুর সেখানেই সুবিধে, তাঁর বাসা থেকে জায়গাটা কাছে পড়ে। তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আর একটা কথা আছে, ওখানে খাওয়াটা ভালো হয়। বেশ হেভি টিফিনের ব্যবস্থা আছে।'

আমরা একসঙ্গে কাজ করতে লাগলাম। কাজ করা মানে বেশির ভাগ সময়ই ঝগড়া করা। তিনি যে বলেছিলেন আমার সঙ্গে অনুগতা স্ত্রীর মত ব্যবহার করবেন, কাজের বেলায় দেখলাম ঠিক উল্টো। অবশ্য নারী প্রকৃতিও তাই।

কোথায় তাঁর সেই বিনয়ী মূর্তি, কোথায় তাঁর সেই আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি। আমি তাঁর কোন কাজের প্রতিবাদ করলেই তিনি টেবিল চাপড়ে বলেন, 'এটা কাগজের ওপর গল্প লেখা নয় মশাই, সেলুলয়েডের উপর লেখা, এক লাখ সোয়া লাখ টাকা ব্যয়। আপনার সেন্টিমেন্টের চেয়ে আমার কাছে মাস সেন্টিমেণ্ট অনেক বড়। আমাকে কমার্শিয়াল দিকটা দেখতে হবে, বক্স অফিসের কথা ভাবতে হবে। আপনার কথা মত চলে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে পারবনা।'

আমি বললাম, 'মানে মারটা আমিই শুধু বসে বসে খাব?'

এমনি করে চলল প্রায় বছর খানেক। প্রডিউসার মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ান। হেসে বলেন, 'ব্যাপার কি? আপনাদের বনিবনাও হচ্ছে না বুঝি?' হরগোপালবাবু আমাকে চোখের ইশারা করেন। আমি অমনি চেপে যাই, মৃদু হেসে বলি, 'না না, তেমন কিছু নয়, তেমন কিছু নয়।'

হরগোপালবাবু আমাকে আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দাম্পত্য কলহ কি

পারিবারিক কলহের কথা যেমন বাইরে প্রকাশ করতে নেই, তেমনি লেখক আর ডিরেকটরের মতভেদের কথা জানতে পারলে প্রডিউসার বিগড়ে যাবেন, তাঁর মন ভেঙে যাবে। তিনি বই তোলা বন্ধ করে দেবেন।

হরগোপালবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'অমন কাজটিও করবেন না মশাই। বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আমার সঙ্গে ঝগড়া করুন, দরকার হয় আমাকে হাতে করে মারুন কিন্তু ভাতে মারবেন না। জানেন অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর এতকাল বাদে আমি একটা চানস্ পেয়েছি। আমার মত বয়সে এই প্রথম চানস্। ভেবে দেখুন। কি কষ্টই যে গেছে দেহের ওপর দিয়ে, ফ্যামিলির ওপর দিয়ে তার ঠিক নেই। এ কোম্পানি থেকে সে কোম্পানি, এ ষ্টুডিও থেকে সে ষ্টুডিও কেবল ঘুরে বেড়িয়েছি। তবু এ লাইনে ষ্টিক করে আছি, এই আর্টকে নেহাৎ ভালোবাসি বলে ভেবেছি একবার না একবার চানস্ পাবই।'

বলতে বলতে হরগোপালবাবুর চোখ ছল ছল করে উঠল। আমি বললাম, 'ওসব কথা থাক। আসুন আমরা কাজ করি।'

তিনি বললেন, 'দাঁড়ান। আমাকে শেষ করতে দিন। হ্যাঁ, ভেবেছি একটা চানস্ পাবই। আর যদি পাই তাহলে দেখিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব আমি কি। আর আমি কি করতে পারি। সেই চানস্ এত কাল বাদে এসেছে। ওয়ান ক্রাউডেড আওয়ার অব গ্লোরী—পড়েছেন তো? আমি ট্রেডকে দেখিয়ে দেব আমি কি দিতে পারি। আর পছন্দমত গল্পও পেয়ে গেছি আপনার কাছ থেকে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু গল্পটা তো আপনার গোড়াতে পছন্দ হয়নি।'

তিনি বললেন, 'সে কথা ছেড়ে দিন, সে কথা ছেড়ে দিন। এখন আপনার গল্প আমার নিজের গল্প। আমার রক্ত মাংস, প্রাণ। আপনি ওই গল্প লেখার পর আরও এক শ লিখেছেন, অন্তত লেখার কথা ভেবেছেন। কিন্তু আমি ওই একটি নিয়ে পড়ে আছি, ওই একটি।'

আমি নরম হই। আপস করার দিকে ঝুঁকি। দুদিন যেতে না যেতে

আবার ঝগড়া বাধে। আবার তিনি টেবিল চাপড়ান। আর আমি তাঁকে সভ্য ভাষায় যা নয় তাই বলে গালাগাল করি।

প্রডিউসার মাঝে মাঝে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন। আর মৃদু মৃদু হাসেন। যেন ষাঁড় আর মোষের লড়াই দেখছেন।

শুধু স্ক্রিপট লেখাই নয়। আরো অনেক কাজ আছে হরগোপালবাবুর। অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন তার মধ্যে প্রধান কাজ। অবশ্য তাতে আমার কোন হাত নেই। আমার কোন সহযোগিতা তিনি এ ব্যাপারে চান না। ষ্টুডিওর অফিস ঘরে বসে তিনি আর তাঁর সহকারী এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আর মাঝে মাঝে আর্টিস্টদের ইনটারভিউ নেন। নতুন, অতি নতুন আবার অতি পুরনো অবসর পাওয়া জ্যোতি হারানো তারকারা সব আসেন তাঁর কাছে।

আমার সংলাপ লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁদের সম্বন্ধে গল্প করেন। বলেন, 'জানেন কল্যাণবাবু, আগে যারা আমাকে পুঁছতনা, দেখলে চিনতে পারত না, তারাও এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কাছে বসে থাকে। অফিসে যায়, বাসায় যায়। দুনিয়ার এই নিয়ম। কিন্তু আমি সহজে ভুলিনে। আমি খুব fastidious। পুরনো আর্টিস্টদের মধ্যে যদি suitable তেমন কাউকে না পাই আমি অডিয়েন্সকে নতুন মুখ দেখাব। নতুন তারা এনে দেব আপনাকে। হিরোইন নিয়েই হয়েছে যত মুশকিল। দিতে পারেন আমাকে একটি সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী মেয়ের সন্ধান? অভিনয়ের জন্য ভাববেন না। অভিনয় আমি জানি। যাত্রা থিয়েটার এ জীবনে অনেক করেছি। ফিল্মেও যে দু একবার নামিনি তা নয়। Acting আমি তাকে শিখিয়ে দিতে পারব। দিন না মশাই একটিকে খুঁজে পেতে। আপনাদের তো অনেক জানাশোনা আছে।'

অসহায় হয়ে বলি, 'কোথায় আর জানাশোনা। মেয়েদের সঙ্গে সত্যিই যদি পরিচয় থাকত তাহলে কি আর বানিয়ে বানিয়ে অত গল্প লিখতে যাই। আমাদের সব কল্প জগতের ব্যাপার।'

হরগোপালবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনাদের গল্প তো শুনি মেয়েরাই পড়ে, মেয়েরাই বেশি ভালোবাসে। তাঁদের চোখে ফাঁকি ধরা পড়েনা?'

বললাম, 'পড়ে বই কি, তবে তাঁরা অনেক সময় ক্ষমা ঘেন্না করে নেন। তাছাড়া লেখকদের কলম থেকে নিজেদের সম্বন্ধে তাঁরা মিথ্যে কথা শুনতে ভালোবাসেন। আমাদের যেমন তাঁদের মুখের অনৃতও অমৃতের মত লাগে।'

হরগোপালবাবু একটু হাসলেন। টেবিলের দুই দিকে দুই চেয়ার নিয়ে আমরা মুখোমুখি বসে কাজ করছিলাম। তাঁর ফরমায়েস মত পাত্র পাত্রীর মুখে কথা বসাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তিনি বললেন, 'দেখেছেন কি সুন্দর রামধনু। এতক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছিল, কখন যে থেমে রামধনু উঠেছে টেরই পাইনি। ঝড়বৃষ্টিকে ভয় পাবেন না। আমাদের আকাশেও রামধনু উঠবে মশাই, নিশ্চয়ই উঠবে। ডিষ্ট্রিবিউটর ঠিক হয়ে গেছে আমাদের।' তারপর ফের একটু মৃদু হাসলেন হরগোপালবাবু, বললেন, 'একটি মেয়েকে আমি জানি। নিজের মুখে বলতে নেই। তবে সত্যিই সুন্দরী। আমি তাকে বলি, তোমাকে মানাবে, অনীতার রোলে তোমাকে মানাবে। তুমি নেমে পড়। আমার জীবনে ফের একটা চান্স আসে কি না আসে তুমি নেমে যাও।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েটি কে।'

তিনি বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

আমি এবার বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম।

হরগোপালবাবু বললেন, 'অমন করছেন কেন মশাই? আপনি ভাবছেন সে বুঝি আমার মত বুড়ী আর কালো কুচ্ছিৎ? মোটেই না মোটেই না। আমার প্রায় মেয়ের বয়সী, আর দেখতে কি আর বলব? নিজের মুখে বলতে নেই। সতীকে খুবই মানাত। কিন্তু একথা শুনলে ও তেড়ে আসে। বলে তোমার ভীমরতি হয়েছে।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপনার গল্পের ওপর ওর খুব রাগ।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কেন?'

তিনি একটু হাসলেন। 'সতী নিজেও বিধবা ছিল যে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সে কথা তো এর আগে বলেন নি।'

হরগোপালবাবু আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তাঁর হাসিতে গূঢ় রহস্যের ব্যঞ্জনা। তিনি বললেন, 'আপনি বিধবার মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার সঙ্গে কি তর্কই না করেছেন। আমি শুনেছি আর মনে মনে হেসেছি। অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবার মন যে কি বস্তু তা আপনি আমার চেয়ে বেশি কি করে জানবেন।'

তারপর আস্তে আস্তে নিজের বিয়ের কথা বললেন হরগোপালবাবু। তাঁরও দ্বিতীয় পক্ষেরই বিয়ে। এক দরিদ্র দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাঁর বিধবা মেয়েকে নিয়ে হরগোপালবাবুর আশ্রয়ে এসেছিলেন। মা মারা যাওয়ায় মেয়েটি বড়ই বিপদে পড়ে। হরগোপালবাবুরও গৃহ শূন্য। শেষ পর্যন্ত এক দুর্বল মুহূর্তে বিয়ে করে বসেন। মেয়েটিও আর কোন উপায় না দেখে রাজী হয়ে যায়। এই নিয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে হরগোপালবাবুর বিরোধ হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে তাঁদের তেমন সদ্ভাব নেই।

স্ত্রী হরগোপালবাবুর খুবই অনুগত। কৃতজ্ঞতা আছে মনে। ছেলেপুলে হয়নি। মোটামুটি লেখাপড়া জানেন। কর্পোরেশন স্কুলে টিচারি করেন। তাই কোন রকমে খেয়ে পরে আছেন হবগোপালবাবু। নইলে সংসারের অবস্থা অচল হয়ে যেত।

স্ত্রীর উপর মাঝে মাঝে ভারি মায়া হয় হরগোপালবাবুর। আহা বেচারা তো আর কিছুই পেলনা। দরিদ্র স্বামীব কাছ থেকে দামী দামী শাড়ি নয় গয়না নয়। স্বামীর যৌবন পর্যন্ত এসে সে দেখতে পেলনা। তাকে কিসের ভাগ দিতে পারেন হরগোপালবাবু! এক যশের ভাগ ছাড়া! তাঁর স্ত্রীরও এখন একমাত্র সাধ, একমাত্র স্বপ্ন—নাম করা ডিরেক্টরের স্ত্রী হবে। তাইতো হরগোপালবাবু এই ছবিটা শেষ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর আশা এটা শুধু হিট-পিকচার হবেনা, প্রেষ্টিজ পিকচারও হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেক কোম্পানি থেকে অনেক অফার পাবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। ঠিক বিনা মেঘে নয়। মেঘের

আভাস এক একবার পাচ্ছিলাম। প্রডিউসার তিন তিনবার হরগোপালবাবুর স্ক্রিপট ফেরত দিলেন, বললেন, 'নতুন করে লিখুন।'

চতুর্থ বার বললেন, 'আর লিখবেন না। ডিষ্ট্রিবিউটার গল্প রিজেক্ট করেছে। যা বাজার ওসব থীম নিয়ে নামতে সাহস পাচ্ছেনা।'

হরগোপালবাবু আমাকে বাড়ি বয়ে এসে অভিশাপ দিতে লাগলেন, 'কি অলুক্ষুণে গল্পই লিখেছিলেন মশাই। লিখবার আর বিষয় পেলেন না। আমার সব পরিশ্রম পণ্ড হল। আপনার কি। আপনি তো আবার সধবা অধবা যাকে পাবেন তাকে নিয়ে লিখবেন। কিন্তু আমি কি করি। আমার যে সব গেল।'

অবশ্য তার পরেও হাল ছাড়লেন না হরগোপালবাবু। অন্য ডিষ্ট্রিবিউটরের খোঁজ-খবর করতেও লাগলেন। আমাকে দিয়ে আরো একবার স্ক্রিপট সংশোধন করালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ফ্লোরে যাওয়ার আগেই বই বন্ধ হয়ে গেল।

প্রডিউসার মিঃ সেহানবীশ অন্য পরিচালক দিয়ে অন্য বই শুরু করলেন।

তারপর মাস ছয়েকের মধ্যে হরগোপালবাবুর আর কোন খোঁজ খবর পেলাম না। নিলামও না। কারণ তাঁর মতে আমি অপয়া। আমার মতে তিনি। আমাদের মুখ দেখাদেখি না হওয়াই ভালো।

তবু দেখা হল। মিঃ সেহানবীশ তাঁর নতুন ছবি 'শাশ্বতীর' ট্রেড শোতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভাবলাম নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তা রক্ষা করাই ভালো। গিয়ে দেখি প্রেক্ষাগৃহে হরগোপালবাবুও এসে হাজির। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি কাছে ডাকলেন। পাশে বসতে বললেন। তাঁর বাঁ পাশে আর একটি ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। হরগোপালবাবু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী'।

দেখলাম, হরগোপালবাবু মিথ্যা বলেননি। তাঁর স্ত্রী মোটামুটি সুন্দরী এবং বয়সও তিরিশের নীচে। আমার নাম শোনবার পরে তাঁর মুখে কিসের ছায়া পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে নমস্কার জানিয়ে সামনের দিকে তাকালেন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। এবার বই আরম্ভ হবে।

মিনিট কয়েক বাদেই আমি বললাম, 'আরে হরগোপালবাবু, এ যে আপনি। শাশ্বতীতে আপনিও নেমেছেন তাতো জানা ছিল না।'

হরগোপালবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কি আর করি মশাই, বেকার বসে-ছিলাম। দু-পাঁচটাকা যা আসে তাই লাভ। ডিরেকটর সূর্যবাবুর অনুরোধে নিয়ে নিলাম রোলটা। কদিন বা আছি। হয়তো এ চান্সও আর পাবনা।'

কথা বন্ধ করে ছবির গল্পটা বুঝবার চেষ্টা করলাম, আরে সূর্যবাবু যে হরগোপালবাবুকে একজন ডিরেকটরের ভূমিকাই দিয়েছেন। খুব তো রসবোধ আছে তাঁর। ছবির মধ্যে আর একটি ছবির পরিচালনা করছেন হরগোপাল-বাবু। ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু হরগোপালবাবুর চেষ্টার ত্রুটি নেই। তাঁর সাধ্যমত ভালো অভিনয়ই করে যাচ্ছেন।

আমি একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তাব পর তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, 'চমৎকার হচ্ছে, হরগোপালবাবু।'

তিনি একটু খুশি হয়ে বললেন, 'তাই নাকি ? আমার স্ত্রী তো কিছুতেই আসবেনা। ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি। বলেছি আমার অভিনয় তো তুমি দেখনি। চল একসঙ্গে বসে দেখি। বলা যায় না, হয়তো এটুকু সুযোগও আর আসবে না। পৃথিবীতে কোন কিছুর ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই মশাই।'

আমি বললাম, 'কি যে বলেন।'

হরগোপালবাবু একটু হেসে বললেন, 'আগে সংসারটাকে বলা হত ষ্টেজ। এখনকার মহাকবি বলবেন স্ক্রীন। এটা ফিল্মের এজ কিনা। সত্যি ভাবতে গেলে গোটা জীবনটাই একটা পর্দা। তার খানিকটা সামনে বাকিটা আড়ালে, কি বলেন কল্যাণ বাবু ?'

পিছন থেকে এক অপরিচিত ভদ্রলোক হরগোপালবাবুর পিঠে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'থামুন তো মশাই, আপনার বকবকানির জালায় ছবিটা দেখতে পাচ্ছি নে।'

হরগোপালবাবু অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর ভঙ্গীতে বললেন, 'দেখুন, দেখুন।'

আমরা কথা থামিয়ে ফের ছবি দেখায় মন দিলাম।

নুনিয়া

গেটের সামনে রিক্শা থেকে সুধাময় তার স্যুটকেশটা নিয়ে নামতে না নামতেই কালো কুচকুচে পালোয়ানী চেহারার এক যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'দিন বাবু, আমাকে দিন।'

ছ ফুট দেহ, চওড়া বুক, চৌকো চোয়াল, আর চ্যাপটা চিবুকওয়ালা লোকটির দিকে তাকিয়ে সুধাময় মৃদু হেসে বলল, 'এই এ্যাটাচি কেসের মত স্যুটকেশ তোমার হাতে মানাবে না, এটা আমিই নিই।' লোকটি সেকথা গ্রাহ্য না করে সুধাময়ের হাত থেকে স্যুটকেশটা নিতে নিতে বলল, 'আমাকে দিন বাবু।'

সুধাময় বুঝতে পারল তার কথার ব্যঞ্জনা লোকটির বোধগম্য হয়নি।

'তোমার নাম কি', সুধাময় এবার জিজ্ঞাসা করল।

লোকটি জবাব দেওয়ার আগেই বার তের বছরের একটি ছেলে সোৎসাহে বলে উঠল, 'গোবিন্দ, বাবা। আমাদের নুনিয়া। ওর কথা তো তোমাকে অনেক লিখেছি।'

'ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে শিবু।'

শিবতোষ সুধাময়ের ছেলে। পুরীতে এসে সমুদ্রের বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এই নতুন বন্ধু গোবিন্দের কথাও অনেকবার সে বাবাকে চিঠিতে জানিয়েছে। এমন লোক আর হয় না, এমন চমৎকার নুনিয়া পুরীতে আর দ্বিতীয় নেই।

শিবুরই সমবয়সী ফ্রকপরা একটি কিশোরী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করল, 'আমিও তো আপনাকে লিখেছি কাকাবাবু। গোবিন্দর কাছে আমি চমৎকার সাঁতার শিখেছি। আমার সঙ্গে সাঁতার কেটে শিবু পারে না। আমি যত দূর যাই, ততদূর কিছুতেই যেতে পারে না ও।'

সুধাময় হেসে বলল, 'তাই নাকি হেনা? সত্যি বলছ!' তার স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে সপ্তাহ তিনেক আগে এই বন্ধু-কন্যাটিও পুরীতে বেড়াতে এসেছে।

শিবু বলল, 'মিথ্যে কথা বাবা। হেনা কোনদিন আমার সঙ্গে পারে না।'

সুধাময়ের স্ত্রী অণিমা হেসে বলল, 'যাক যাক, আব ঝগড়া করতে হবে না তোমাদের। দিনরাত দুটির মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে।'

সুধাময় মৃদু স্বরে বলল, 'থাকুক। ওদেব বয়সে ঝগড়াতেই সুখ। এতো মাসেব শেষে বাজার খরচ নিয়ে আমাদের দাম্পত্য কলহ নয়।'

অণিমা চোখের ইশারায় স্বামীকে থামিয়ে দিল। সব পরিহাস ওদের সামনে করা ঠিক নয়। তের বছরের ছেলেমেয়ে অনেক কথাই বোঝে। যতটুকু বোঝে তার চেয়ে আন্দাজ করে নিতে পাবে বেশি। তা আরো সাংঘাতিক।

গোবিন্দ এই পারিবাবিক মিলনক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে হঠাৎ অণিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ঘাটে যাই দিদিমণি। আপনাবা কিন্তু সকাল সকাল বাবুকে নিয়ে আজ চান করতে যাবেন।'

অণিমা বলল, 'আজ ঠিক দশটাব মধ্যেই যাব। তুমি তৈরী থেকো। আমাদের জন্যে দবকার হবে না। বাবু নতুন মানুষ। তাব জন্যেই ভাবনা।'

গোবিন্দ হেসে বলল, 'কোন ভাবনা নেই দিদিমণি। আমি খুব ভালো কবে বাবুকে চান করিয়ে দেব। সাঁতার শেখাব। আপনারা একসঙ্গে সাঁতবাবেন। পাল্লা দেবেন দুজনে। কে হারে কে জেতে সবাই দেখবে।' অণিমা লজ্জিত হযে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যাও এবার।'

সুধাময় বলল, 'খুব রসিক চূড়ামণি তো। এত বস পেল কোথায়। নিশ্চয়ই কোন বাঙালিনীব কাছে।' অণিমা বলল, 'আহা। কোন যদি আগল থাকে তোমাব মুখের।'

তারপর স্বামীপুত্রকে নিয়ে বাড়িব ভিতরে ঢুকল অণিমা। লৌহ-ব্যবসায়ী এক বড়লোক বন্ধুর বাড়ি। সুধাময় এপর্যন্ত পুরীতে যায়নি শুনে সেই বন্ধুই গরজ করে পাঠিয়ে দিয়েছে, 'যাও বউদিকে নিয়ে ঘুরে এসো। হোটেল

হোটেলে উঠে দরকার কি, আমাদের বাড়িটাতো পড়েই আছে। কোন অসুবিধে হবে না তোমার। মালী আছে, ঠাকুর চাকর আছে। পাওা সুনিয়া সব বাঁধা। গিয়ে দয়া করে তোমরা উঠলেই হয়। কতদিন ধরেই তো বলছি তোমাকে।'

তা বলেছে বটে বিশ্বনাথ। কিন্তু বললেই তো শুধু হয় না। পুরীতে তাদের বাড়িই না হয় আছে। কিন্তু শুধু সেই বাড়ি থাকলেই যাতায়াতের ভাড়া, সেখানে থাকবার খরচ, অফিসের ছুটির ব্যবস্থা, একসঙ্গে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। এক অখ্যাত মার্চেণ্ট অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীর পক্ষে সপরিবারে ভ্রমণ অসঙ্গত বিলাসিতা। কিন্তু অণিমা কোন যুক্তিতর্ক মানতে চাইল না। এতদিন পরে বেড়াবার একটা সুযোগ যখন পাওয়া যাচ্ছে, তা সে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না। কদিনের জন্য বিশ্বনাথদের একটি আত্মীয় পরিবারও যাচ্ছেন পুরীতে। তাঁরাও এই বাড়িতে গিয়েই উঠবেন। অণিমা ছেলে নিয়ে অনায়াসে তাঁদের সঙ্গে যেতে পারে। পরে যেন সুধাময় দশ পনের দিনের ছুটি নিয়ে অণিমাদের গিয়ে নিয়ে আসে।

খানিকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর অগত্যা সেই ব্যবস্থাতেই রাজী হয়েছে সুধাময়। ঝগড়াঝাটির চেয়ে স্ত্রীকে সমুদ্রতীরে পাঠান ভালো। একঘেয়ে কলহ-বিচ্ছেদকে এড়াতে হলে স্বেচ্ছাকৃত বিরহ সৃষ্টির প্রয়োজন।

কিন্তু দিন পনের যেতে না যেতেই হিসেবে গরমিল হয়ে গেছে। সমুদ্রের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সুধাময়কে আসবার জন্যে অনুরোধ করবার সঙ্গে সঙ্গে অণিমা লিখেছে, 'টাকা পাঠাও, আরো টাকা পাঠাও।'

সুধাময় এসেই স্ত্রীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করল, 'এত টাকা তোমার লাগল কিসে বলতো।'

অণিমা বলল, 'না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই টাকার হিসেব। আমি জমা খরচ রেখেছি। সব তোমাকে বুঝিয়ে পাই ফার্দিং-এর হিসেব মিলিয়ে দেব। ভয় নেই এক পয়সাও তহবিল তছরূপ করব না।'

তারপর অতিরিক্ত খরচের কারণটা স্বামীকে বুঝিয়ে বলল অণিমা। বিশ্বনাথবাবুদের যে পরিবারটি এখানে এতদিন ছিলেন, তাঁরা বড়লোক। তাঁদের সঙ্গে চালচলনে মানিয়ে থাকতে হয়েছে অণিমাকে। বিদেশে এসে নিজেদের মর্যাদাতো ক্ষুন্ন করতে পারে না। আর পনের বছর একটানা একভাবে কাটিয়ে একটা মাসের জন্যেও কি একটু ভালোভাবে থাকবার ইচ্ছা হতে পারে না অণিমার? সুধাময়কে স্বীকার করতে হলো, 'তা পারে।' কেরাণীর স্ত্রীরও কদিনের জন্যে রাণী হওয়ার শখ যায়। অণিমা বলল, 'তুমি খরচপত্তর নিয়ে আর খুঁতখুঁত কোরো না। আর মাত্র গোটা সাতেক তো দিন। তোমার কাছে যা আছে, তাতেই কুলিয়ে যাবে। দেখ কি সুন্দর বাড়ি, এমন ভালো বাড়িতে আমরা কোনদিন থাকিনি, দেখ কি চমৎকার জায়গা, এমন জায়গায় কোনদিন আর আসিনি।'

সত্যিই আর খুঁতখুঁত করে লাভ নেই। স্ত্রীর উল্লাসটাকে নিজের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে দিল সুধাময়। চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখল। পীচ ঢালা বড় রাস্তার ওপর সুন্দর ছোট্ট একতলা ছবির মত বাড়িটি। সামনে প্রশস্ত কম্পাউণ্ড। তার ওপারে ঝাউয়ের সারি। কিছুদূর থেকে মেঘের ডাকের মত ডাক শোনা যাচ্ছে।

সুধাময় বলল, 'ওই বুঝি সমুদ্র?'

অণিমা মৃদু হাসল, 'হ্যাঁ। এখান থেকে দেখা যায় না, শুধু বাঁশি শোনা যায়। কিন্তু মোটেই দূর নয়, দু-পা এগোলেই দেখতে পাবে। শিবু, যাও না, ওঁকে সমুদ্র দেখিয়ে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে চা আর খাবার করছি।'

শিবু বলল, 'চল বাবা, আমিই তোমাকে প্রথম সমুদ্র দেখাব।' গৌরবে আর আত্মপ্রসাদে ভরে উঠেছে শিবুর মুখ।

সুধাময় হেসে বলল, 'চল।'

হেনা ছুটে এল, 'কাকাবাবু, আমিও আসব?'

সুধাময় বলল, 'আসবে বইকি, এসনা।'

মিনিট পাঁচেকের পথ এগোতেই সমুদ্র। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুধাময়। শিবু আর হেনার মত সমুদ্র তাকে বিস্মিত করল না। এ সমুদ্র সে সিনেমায় দেখেছে, লেখকদের বর্ণনায় পড়েছে। সুধাময়ের কাছে সমুদ্র মোটেই অকল্পনীয় কিছু নয়। তবু দেখে খুশি হলো, দেখে ভালো লাগল সুধাময়ের। হ্যাঁ, এর কাছে এলে তুচ্ছ দৈনন্দিনতাকে ভোলা যায়, হিসেবের খাতার কথা মনে পড়ে না।

একদল স্নানার্থীর সঙ্গে কথা বলছিল গোবিন্দ। সুধাময়দের দেখে ছুটে এল, 'চান করবেন তো, বাবু? তৈরী হয়ে আসুন।'

সুধাময় বলল, 'একটু পরে আসব। এসে তোমাকে ডেকে নেব।'

গোবিন্দ বলল, 'আমাকে ডাকতে হবে না বাবু। আমি এখানেই আছি। এই আমার ঘরবাড়ি।'

সুধাময় বলল, 'তাই নাকি? তুমি তো বেশ ভালো বাংলা শিখেছ।' গোবিন্দ সবিনয়ে জানাল সে বাংলা উড়িয়া তেলেগু তিনটি ভাষা জানে। তা ছাড়া ইংরেজিও কিছু কিছু বলতে পারে।

দু তিন দিনের মধ্যেই গোবিন্দ সুধাময়কে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিল। কাকে বলে ব্রেকার, কাকে বলে রোলার, কখন ডুব দিতে হয়, কখন লাফিয়ে উঠতে হয়, সব কৌশল একটু একটু করে শিখে নিতে চেষ্টা করল সুধাময়। চেষ্টা যে খুব সার্থক হলো তা নয়, তার অপটুতা দেখে অণিমা, শিবু, হেনা তিনজনে হেসেই অস্থির।

অণিমা বলল, 'ওইভাবে চান করে বুঝি? আছাড় খেয়ে তোমার হাত-পা ভাঙবে। তুমি বরং ওপরে দাঁড়িয়ে ঢেউ গোন, আর আমরা কি করে চান করি তাই দেখ।'

অপ্রতিভ সুধাময়কে গোবিন্দ ভরসা দেয়, 'আপনিও পারেন বাবু, দুদিন গেলে আপনিও পারবেন। দিদি কতদিন ধরে শিখছেন। কিন্তু বড় ভালো শিখেছেন। এমন সাঁতার আর কোন মেয়ে কাটতে পারে না বাবু, একথা সত্যি বলছি।'

শিবু সাঁতার কেটে অনেক দূর চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলল, 'আর আমি, গোবিন্দ ?'

গোবিন্দ সস্নেহে হেসে বলল, 'তুমি তো ওস্তাদ। এর মত সাহস আর কোন ছেলের নেই। আমাদের নুনিয়াদের ছেলেরাও এমন সাঁতার কাটতে চান করতে পারে না।'

স্ত্রী-পুত্রের দক্ষতায় গৌরব বোধ করতে চেষ্টা করে সুধাময়। হেনা মুখ ভার করে বলল, 'গোবিন্দ, আমি ?'

গোবিন্দ হেসে বলল, 'তুমিও খুব ভালো খুকি। তোমাকে দেখেই তো খোকাবাবুর অত সাহস।'

অণিমা সুধাময়কে আড়ালে ডেকে মুখ টিপে হেসে বলল, 'শুনছ গোবিন্দর কথা? হেনাকে দেখে নাকি শিবু সাঁতরাবার উৎসাহ পায়, সাহস পায়। আর আমাকে দেখে তুমি মোটেই সাহস পাচ্ছ না ?'

সুধাময় বলল, 'না, বরং ভয় পাচ্ছি।'

শুধু শিবু নয়, হেনার সঙ্গে অণিমাও পাল্লা দিয়ে সমুদ্রস্নান করে। সমুদ্রের ছোঁয়ায় সেও যেন তের বছরের কিশোরীতে পরিণত হয়েছে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে সে অনেক দূর চলে যায়। কখনো বা হেনার মত লঘু চাঞ্চল্যে সে গোবিন্দের কাঁধ জড়িয়ে ধরে। খানিকটা দূরে গিয়ে গোবিন্দকে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে ধরতে হবে না গোবিন্দ, বাবুকে ধর, বাবুকে ভালো করে চান শেখাও, সাঁতার কাটা শেখাও।'

জলে নামলে আর উঠতে চায় না অণিমা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করে, সাঁতার কাটে। সংসারের ভাবনা নেই, রান্নাবান্নার ভাবনা নেই। ঠাকুর চাকর আছে, তারাই সব করে। সমুদ্র অণিমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। রোজ ভোরে উঠে সমুদ্রের ধারে বেড়ানো আর শিবু হেনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝিনুক কুড়োন। দুপুরে ঘণ্টা তিনেক করে স্নান, তারপর বিকেলে আবার সমুদ্র। কখনো স্বর্গদ্বারের দিকে, কখনো চক্রতীর্থের দিকে মুখ করে হাঁটতে থাকা। ঢেউ এসে বার বার পা ভিজিয়ে দেয়, শাড়ির প্রান্ত ভিজিয়ে দেয়। তারপর,

সেই ভিজে কাপড় নিয়েই বালির মধ্যে এক জায়গায় বসে পড়ে অণিমা। সুধাময়কে হাত ধরে টেনে বসায়।

সুধাময় বলে, 'চল, এবার ফিরি। ভিজে কাপড়ে তোমার অসুখ করবে যে।'

অণিমা বলে, 'অসুখ না ছাই। এখানকার বালিও গায়ে লাগে না, জলও গায়ে লাগে না। সমুদ্রের হাওয়ায় কোন অসুখ করে না। এখানে সবই সুখ। আরো আগে আমরা কেন এলাম না এখানে?'

সুধাময় বলে, 'কত আগে? শিবু আর হেনার মত বয়সে? কোথায় গেল ওরা, এই অন্ধকারে!'

অণিমা আরো কাছে এসে বসে, 'ওদের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। এখানকার ওদের সব চেনা হয়ে গেছে। ওরা ঘুরে ঘুরে ঠিক সময়মত বাড়ি যাবে। এসো আমরা আরো বসি খাণিকক্ষণ।'

খানিকটা দূরে এখানে ওখানে আরো কয়েকটি তরুণযুগলকে দেখেই বোধ হয় অণিমার এই সাধ জেগেছে। সুধাময় আপত্তি করল না।

অন্ধকারে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অণিমা বলল, 'জ্যোৎস্নায় সমুদ্র দেখেছি, অন্ধকারেও দেখলাম। শুধু ঝড়টা দেখা হলো না। সমুদ্রের ঝড়টা দেখবার মত। বইয়ে পড়েছি।'

জ্যৈষ্ঠের শেষ। কিন্তু ঝড় তো দূরের কথা, আকাশে সামান্য মেঘের চিহ্নও নেই। দিনের বেলায় বাইরে খাঁ খাঁ করে রোদ। কিন্তু সমুদ্র আছে বলে, সমুদ্র কাছে বলে গরম লাগে না।

সেদিন অণিমা শিবু আর হেনাকে নিয়ে প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গেছে, সেই ফাঁকে একাই বেরিয়ে পড়ল সুধাময়। সমুদ্রের ধার দিয়ে খানিকটা হাঁটতেই গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরনে হাফ প্যাণ্ট মাথায় পাতার টুপি।

সুধাময় বলল, 'তোমাদের টুপিগুলি তো বেশ দেখতে।'

গোবিন্দ বলল, 'নেবেন বাবু? আপনাকে একটা তৈরী করিয়ে দেব। দুটাকা লাগবে। কলকাতার অনেক বাবু শখ করে নিয়ে যায়।'

সুধাময় নিজের পকেটের কথা ভেবে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমার তত

শখ নেই। আচ্ছা, দরকার হলে তোমাকে পরে বলব। তোমরা থাক কোথায়?'

গোবিন্দ বলল, 'এইতো কাছেই। আসুন না বাবু।'

একটু কৌতূহল হলো সুধাময়ের। গোবিন্দের পিছনে পিছনে কয়েক পা এগুতেই একটা নোংরা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকতে হলো। খড় আর পাতার ছাউনি। সারি সারি কুঁড়ে। নুনিয়া পল্লী। একটি ঘরের সামনে এসে গোবিন্দ থেমে দাঁড়াল। কালো রোগা লম্বামত একটি স্ত্রীলোক বাইরে বসে জাল বুনছিল। সুধাময়দের দেখে মাথায় আঁচল টেনে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গোবিন্দ বলল, 'আমার বউ।'

সুধাময় বলল, 'মাচ ধরার জাল বোনা হচ্ছে বুঝি? তুমি সমুদ্রে মাছ ধরো?'

গোবিন্দ বলল, 'না বাবু, আর সব নুনিয়ারা ধরে। আমরা জাল বিক্রি করি। আপনি নেবেন একটা জাল?'

সুধাময় বলল, 'না না, আমি জাল দিয়ে কি করব?'

গোবিন্দ বলল, 'নিন না। অনেক বাবু শখ করে নেন। খুব সস্তায় দেব।'

সুধাময় বলল, 'না না। দরকার হলে তোমাকে পরে বলব।'

পাঁচ থেকে দশ বার বছর বয়সের চারটি ছেলে মেয়ে একটু দূরে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। সব কটিই উলঙ্গ।

সুধাময় বলল, 'তোমার ছেলেমেয়ে বুঝি?'

গোবিন্দ বলল, 'হ্যাঁ বাবু।'

তারপরই অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল গোবিন্দ। তার ঘরে মন্ত্রপড়া কবচ আছে। খুব ভালো কবচ। এই কবচ সঙ্গে থাকলে কোন বিপদ আপদ স্পর্শ করতে পারে না, কোন অসুখ বিসুখ হয় না। কলকাতার অনেক বাবু এই কবচ নিয়ে ফল পেয়েছেন। সুধাময়কে কি গোটা চারেক কবচ দেবে গোবিন্দ?

সুধাময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'না না না। আমার কিচ্ছু দরকার নেই। তুমি এবার আমাকে বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।'

গোবিন্দ অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'চলুন বাবু, চলুন।'

পরদিন এক কাণ্ড ঘটল। অন্য দিনের মত আজও সবাইকে নিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছে সুধাময়। গোবিন্দ আছে সঙ্গে।

অণিমা সুধাময়ের পাশে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজকের অবস্থা দেখেছ। আজ ঠিক সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে।'

গোবিন্দ হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ দিদি।'

দক্ষিণ দিকে একটু মেঘ করেছে। এমন অন্য দিনও করে। কিন্তু অন্য দিন সমুদ্র সেই মেঘকে এমনভাবে সাড়া দেয় না। আজকের ঢেউগুলি আরো উঁচু, আরো উত্তাল। জলের মধ্যে পা এক মুহূর্ত ঠিক রাখবার জো নেই। সমুদ্র সাগ্রহে আকর্ষণ করছে।

গোবিন্দ অণিমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কি দিদি, যাবে? সাঁতরাবে আজ?'

অণিমা বলল, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার বাবুকেও সঙ্গে নাও। ওর ভয় আজ ভাঙুক।'

গোবিন্দ হেসে বলল, 'চলুন, দুজনেই চলুন।'

তারপর শিবু আর হেনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা ওখানে দাঁড়িয়েই চান করো। পরে তোমাদেব দুজনকেও নিয়ে যাব।'

সমুদ্রের অবস্থা ভালো নয়। বেশি দূর এগোন গেল না। বিশেষ করে অপটু সুধাময়কে নিযে বড়ই অসুবিধে। মিনিট দশেক বাদে দুজনকে নিয়ে গোবিন্দ ফিরে আসছে, হঠাৎ দূর থেকে কাতর চীৎকার শোনা গেল, 'গোবিন্দ! গোবিন্দ!'

শিবুর গলা। কিন্তু কোথায়, কোত্থেকে ডাকছে ও। ওকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শিবু কোথায়?

তীর থেকে হেনা চীৎকার করে বলল, 'শিবু গেল, শিবু ডুবে গেল!'

সবাইর চোখ পড়ল এবার। বিশ পঁচিশ হাত দূরে শিবু ডুবছে ভাসছে আর জল খাচ্ছে আর দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে সরে যাচ্ছে। আশে পাশে যারা স্নান করছিল তারাও চীৎকার করে উঠল, 'গেল গেল।'

অণিমাও সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে ছেড়ে দাও গোবিন্দ, ওকে ধরো, ওকে বাঁচাও।'

মুহূর্তের মধ্যে গোবিন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে। মিনিট দুই তিন কাউকেই দেখা গেল না। না গোবিন্দকে, না শিবুকে। সুধাময় আর অণিমা দুজনের দৃষ্টিই ঝাপসা হয়ে গেছে।

খানিক বাদে দেখা মিলল ওদের। শিবুকে বুকে করে নুনিয়া ফিরে আসছে।

সুধাময়ের দিকে তাকাল গোবিন্দ। তার মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি।

'পেয়েছি বাবু, আর একটু হলেই শেষ হয়ে যেত।' স্ত্রীকে হাত ধরে টেনে তুলল সুধাময়। অণিমার ঠোঁট নীল, মুখ ফ্যাকাশে, চোখ দুটি ছল ছল করছে। একটু আগেও লোনা সমুদ্রে ওর চোখের লোনা জল মিলেছে।

শোনা গেল হেনার সঙ্গে বাজি রেখে শিবু একাই সাঁতরে মা বাবা যতদূর গেছে ততদূর যাচ্ছিল।

অণিমা ঠাস করে ছেলের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'একেবারেই দূরে চলে যাচ্ছিলি যে হতভাগা। কি সবনাশ হত আজ বলতো। আমার বুক কাঁপছে। চল বাড়ি চল। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে।'

গোবিন্দকে দুজনেই ধন্যবাদ জানিয়ে সাধ্যমত পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

বিকালের দিকে সুধাময় বলল, 'চল, বেড়িয়ে আসি সমুদ্রের ধার দিয়ে।'

অণিমা বলল, 'না বাপু, রক্ষা কর, আর সমুদ্র নয়, ভাবতেই অস্বস্তি লাগছে। কি সর্বনাশ হয়ে যেত আজ। পুরী বেড়ানোর সাধ মিটে গেছে আমার। চল কলকাতায় ফিরে যাই।'

শিবু কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। সে আড়ালে এসে সুধাময়কে বলল, 'আর একটা দেবতার গ্রাস হয়ে যাচ্ছিল বাবা।'

সুধাময় বলল, 'তুমি আবার হাসছ, বাহাদুর ছেলে।'

পরদিন অণিমা আর সমুদ্রে গেল না, শিবুকেও যেতে দিল না, বলল, 'ওর জ্বর জ্বর ভাব হয়েছে। চান করে দরকার নেই।'

হেনা বলল, 'তাহলে আমিও যাব না কাকীমা।'

অণিমার শখ মিটলেও সুধাময়ের বেড়াবার শখ মেটেনি। ও স্ত্রীকে নিয়ে শহর ভরে ঘুরল। তার আতঙ্ক দূর করবার জন্যে তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে কটকী বাজারে গিয়ে বলল, 'তোমার কি পছন্দ বল।'

তারপর নিজের পছন্দমতই পর্দা কিনল, টেবিল ক্লথ কিনল, অল্প দামের মধ্যে শাড়িও কিনল এক খানা। নিজের জন্যে হরিণের চামড়ার চটি জুতো নিল।

থলি প্রায় খালি। এখনো যা আছে তাতে যাওয়ার ভাড়াটা বেশ কুলিয়ে যাবে।

আগের দিনই গাড়ির সিট রিজার্ভ করে রাখল সুধাময়। পরদিন সন্ধ্যায় গাড়ি। কিন্তু ভোর থেকেই বাঁধাছাঁদা শুরু করতে হলো। দড়ি দিয়ে কষে বিছানাটা বেঁধে তুলছে, গোবিন্দ এসে হাসিমুখে হাজির, 'বাবু, আজই যাচ্ছেন, দিন আমি বেঁধে দিচ্ছি বিছানা।'

সুধাময় বলল, 'থাক থাক, আমরাই পারব।'

পাণ্ডা, ঠাকুর, চাকর সবাইকেই হিসেব করে করে অল্প স্বল্প দিয়ে বিদায় করেছে। কিন্তু আশ্চর্য, যার পাওনা সব চেয়ে বেশি, তার কথাই এতক্ষণ সুধাময় ভুলে ছিল।

গোবিন্দ বলল, 'আজই যাচ্ছেন বুঝি? আমার বকশিশ বাবু?'

সুধাময় বলল, 'নিশ্চয়ই, বকশিশ তো তোমার পাওনা আছেই, কত দিতে হবে বল? অবশ্য তুমি যা করেছ, টাকা দিয়ে তার শোধ দেওয়া যায় না। একমাস কাজ করার জন্যে তোমার সঙ্গে তো তিন টাকা চুক্তি হয়েছিল?'

গোবিন্দ স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ বাবু।'

পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে তিন টাকা বের করে দিল সুধাময়, 'বকশিশ কত চাও বল।'

গোবিন্দ বলল, 'আপনি যা খুশি হয়ে দেন বাবু। পাঁচ বছর আগে কলকাতার এক জমিদারবাবুর ভাগ্নেকে বাঁচিয়েছিলাম। তিনি দিয়েছিলেন হাজার টাকা। এখনো সার্টিফিকেট আছে।'

সুধাময় গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জমিদার নই গোবিন্দ।'

গোবিন্দ বলল, 'তিন বছর আগে এক ব্যারিস্টার বাবুর ছেলেকে তুলেছিলাম। তিনি দিয়েছিলেন পাঁচ শ টাকা আর একখানা শাল।'

সুধাময় বলল, 'বাজে কথা রাখ। আমি জমিদারও নই, ব্যারিস্টারও নই।'

গোবিন্দ বলল, 'কিন্তু বাবু, আপনার ছেলের প্রাণের তো দাম আছে।' সুধাময় বলল, 'তা আছে বই কি।' প্রথমে তিন টাকাই দেবে ভেবেছিল কিন্তু আরো একটু হিসেব করে পাঁচ টাকার একখানা নোটই গোবিন্দর দিকে এগিয়ে দিল সুধাময়, একটু ধমকের সুরে বলল, 'নাও, খুশি হয়ে নাও।'

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, 'না, চার পাঁচ টাকা আমি নেব না। একটা জীবন বাঁচিয়েছি—'

হঠাৎ সুধাময় উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠল, 'হারামজাদা, জীবন বাঁচিয়েছ না আরো কিছু করেছ। সব তোমার কারসাজি, সব তোমার ব্যবসা। বাচ্চা ছেলেকে লোভ দেখিয়ে জলে ঠেলে দিয়ে তাকে ফের তুলে এনে পয়সা আদায় করার ফন্দি। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, না?'

গোবিন্দ স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল সুধাময়ের দিকে, তারপর বলল, 'বুঝবেন না কেন বাবু, আপনি সব বুঝেছেন। আপনারা লেখাপড়া জানা লোক, কলকাতার বাবু। কিন্তু আমরা তা করিনে। জীবন নিয়ে আমরা ব্যবসা করিনে বাবু।'

ঘরের ভিতর থেকে, বেরিয়ে এল অণিমা। স্বামীকে ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ, কি করছ তুমি। গোবিন্দ, আমাদের কাছে আর টাকা নেই, তুমি আমার হাতের এই আংটিটা নাও। তুমি যা করেছ, টাকা গয়নায় তা শোধ হয় না।'

আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে গোবিন্দের হাতে দিল অণিমা। গোবিন্দ আংটিটা কপালে ছোঁয়াল একবার, তারপর সেটিকে মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াল, 'না দিদি, আমার বকশিশ আমি পেয়ে গেছি।'

বলেই পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল গোবিন্দ। সুধাময়ের মনে হলো, ওর পিঠটাও ভারি কালো আর চওড়া।
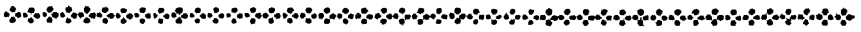
না লেখা গল্পের নায়িকা

লিখিত গল্পের নায়িকা আর কজন। একজন লেখকের জীবনে তার অলিখিত গল্পের নায়িকারাই সংখ্যায় বেশি।

'আমাকে নিয়ে একটি গল্প লিখুন', তরুণী পাঠিকা, বান্ধবী, আত্মীয়া-অনাত্মীয়া, পরিচিতা, সগ্যপরিচিতা অনেক—অন্তত একাধিক মেয়ের মুখে এমন একটি মধুর অনুরোধ শোনবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই প্রত্যেক লেখকেরই হয়। আর মুশকিল এই যাঁরা সত্যিসত্যিই অনুরোধ করেন লিখি লিখি করে তাঁদের নিয়ে গল্প লেখা আব হয় না। স্ত্রী হোক, পুরুষ হোক, আপনি হয়ত বেকুবের মত তাঁকে নিয়েই গল্প লিখে বসবেন যিনি আপনার গল্পে তাঁর চেহারার কি চরিত্রের বিন্দুমাত্র ছায়া পেয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন কি চিঠি পাঠাবেন মানহানির মামলার ভয় দেখিয়ে। অথচ যিনি চিঠি লিখে ফোন করে দেখা হলে মধুব হেসে আপনাকে গল্প লেখার জন্যে অনুবোধ জানাচ্ছেন তাঁকে নিয়ে আপনি কস্মিনকালেও লিখবেন না।

অবশ্য সবাই যে অমন সরাসরি স্পষ্ট ভাষায অনুরোধ করেন তা নয়। কেউ কেউ আকারে-ইঙ্গিতে, আভাসে-ইশারায আপনাব গল্পের আয়নায় তাঁর প্রতিবিম্ব দেখবার প্রত্যাশা জানান। আবার কেউ কেউ ঠিক একেবারে উল্টো দিক থেকে শুরু করেন। আপনার দিকে তাকিয়ে শাসন-স্বরে অনুশাসনের তর্জনী তুলে বলেন, 'খবরদার আমাকে নিয়ে কক্ষণো লিখবেন না, বলে দিলাম।'

পুলিস অফিসের (কর্ণিকা-কেরাণির চেয়ে কথাটি মধুব) রমা ব্যানার্জীও ঠিক এইভাবে না-না করেই আরম্ভ করেছিল।

বছর তিনেক আগে পুলিস-কর্মচারীদের একটি হোস্টেলে আমার এক বান্ধবী সুজাতা নন্দীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। বিকেল বেলায় মাঝখানের হল-ঘরে গোল-টেবিলটার ধারে দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কেবল 'কেমন

আছেন ভালো আছি' শুরু করেছি। দেখি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ঝরণার মতো তর তর করে একটি মেয়ে নেমে এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা মেয়েটি। প্রস্থটা দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী হলে এক বিপুল ব্যাপার হতো। তা হয়নি। বরং অনুপাতে কিছু কমই দেখায়। তাই ছিপছিপে রোগা মনে হয় মেয়েটিকে। গায়ের রঙ সুগৌর, নাক-চোখ টানা-টানা। ভ্রূ-দুটি কালো পাতলা, ঠোঁট দুটি রক্তাভ। অতখানি দৈর্ঘ্য সত্বেও চেহারাটা বেমানান লাগে না। বরং সব মিলিয়ে খুব রূপবতী না হোক লাবণ্যবতী বলে মনে হয়।

মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, বান্ধবী তাকে ডাকলেন, 'এই রমা পালাচ্ছিস কেন, আয় আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই সেই কল্যাণবাবু। আর এই আমাদের রমা। ওর কথা আপনাকে আগেও বলেছি।'

নমস্কার বিনিময় করে বললাম, 'হ্যাঁ, সুজাতা দেবীর কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনি ওঁর রুমমেট।'

সুজাতা দেবী বললেন, 'শুধু আমার রুমমেট কেন, রমা হোস্টেল শুদ্ধু মেয়ের রুমমেট। এমন ঘর নেই যেখানে রমা না যায়, কি যার বিছানায় দুএক ঘণ্টা ও জোর করে কাটিয়ে না আসে। এমন কি ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, মালীর সঙ্গেও ওর গভীর বন্ধুত্ব। তারা রমা-দিদিমণি বলতে অজ্ঞান।'

কাছাকাছি আর কোন চেয়ার ছিল না। সুজাতা দেবী জোর করে নিজের চেয়ারের একপাশে ওকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোস, একেবারে বোবা হয়ে গেলি যে, অমনি তো দিনরাত আছিস বক বক করতে। জানেন, রাত্রে এত কথা বলে যে, কিছুতেই একটা বই পড়তে কি ঘুমোতে দেয় না। একদিন বলেছিলাম, রমা, তুই অন্য ঘরে যা, তোর জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেছি। তাতে জবাব দিল কি জানেন?' রমার দিকে তাকিয়ে আমার বান্ধবী হাসলেন, 'বলব?'

রমা হাসিমুখে বলল, 'বল। আমার পিছনেতো এতদিন অনেক বলেছ। আজ যা বলবার আমার সামনেই বল।'

বান্ধবী বললেন, 'শুনলেন কথা। তাহলে কিন্তু সত্যিই বলে দেব। জানেন রমার বড় সাধ ও আমার সতীন হবে। আমাকে খুব ভালোবাসে কিনা, রাহুর প্রেম। ও চিরকাল আমার রুমমেট হয়ে থাকতে চায়। আমি বলি মুখপুড়ী তাই যদি হয়, তাহলে কি আর তুই আমাকে এক ঘরে থাকতে দিবি ? ঘর তো ভালো, বাড়িছাড়া, শহর ছাড়া করবি যে।'

বলতে বলতে সুজাতা দেবী হেসে উঠলেন।

রমাও হাসল, 'সুজাতাদিকে সেই যে ভয় দেখিয়ে রেখেছি, তারপর ও আর বিয়েই করল না। কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এলো কিন্তু বিয়ের নামে সুজাতাদির জলাতঙ্ক। জানে আমি সতীন হলে আমি এস. সি উনি এস. আই এ সম্বন্ধ থাকবে না। একেবারে উল্টে যাবে। তখন আমি রাজমহিষী, সুয়োরাণী, আর উনি কুঁড়ে ঘরের দুয়োরাণী এঁটো-কাঁটা খান আর ঘুঁটে কুড়োন।'

সুজাতাদেবী হেসে বললেন, 'যা বলেছিস, সেই ভয়েই বিয়ে করিনি। আমাদের রমার একটা গতি করে দিন তো। ভালো একটা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখে দিন। তারপর নিশ্চিন্তে ধীরে-সুস্থে নিজের বিয়ের কথা ভাবব।'

একটু বাদে রমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'যাই, সুজাতাদি।'

রমা বলল, 'তাড়া নেই। তবে বেশিক্ষণ কল্যাণবাবুর সামনা-সামনি বসে থাকতে ভয় করে।'

সুজাতাদেবী বললেন, 'কেন ভয় কিসের ? উনি বাঘ না ভালুক।'

রমা বলল, 'উনি তাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। উনি লেখক, আর এক মিনিট বসেছি কি, উনি ওঁর গল্পের মধ্যে আমাকে গিলে ফেলবেন। ওরে বাবা তাহলেই গেছি। কিন্তু খবরদার, আমরা স্ত্রীলোক হলেও পুলিসের লোক। আমাদের নিয়ে গল্প-টল্প লিখতে যাবেন না কিন্তু, তাহলে কলমটি তো যাবেই, হাতেও হাতকড়া পড়বে।'

হেসে বললাম, 'সে ভয় তো আছেই। সেই জন্যেই এতদিন ও চেষ্টা করিনি।'

সুজাতাদেবী বললেন, 'কল্যাণবাবুর অমন একটা বদনাম আছে বটে। উনি নাকি ওঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে গল্প লেখেন। তবে সবাইকে নিয়েই যে লেখেন তা নয়। এই তো আমার সঙ্গে এত দিনের পরিচয় আমাকে নিয়ে তো এ পর্যন্ত একটি গল্পও লেখেন নি।'

রমা ভ্রূ-কুঁচকে সুজাতাদেবীর দিকে তাকাল, 'তোমাকে নিয়ে আবার কি লিখবেন শুনি। তুমি খুব ভালো মেয়ে। অফিসার গ্রেডে চাকরি কর, মনিবদের মন জুগিয়ে চল। সামনের বছর প্রমোশনের আশা আছে। বাস, ফুরিয়ে গেল সব কথা। এতে কি গল্প হয়? শুধু এস-আই হলে যেমন রাজার সুয়োরাণী হওয়া যায় না, তেমনি লেখকের গল্পেব নায়িকাও হওয়া যায় না। তারজন্যে আলাদা যোগ্যতা চাই। জীবনে অনেক রকম ঘটনা ঘটা চাই। কল্যাণবাবু যদি লেখেন আমাকে নিয়েই লিখবেন। ওঁরা সহৃদয় লেখক মানুষ। ওঁদের চোখে দারোগা কনেষ্টবলে তফাৎ নেই।'

সুজাতাদেবী হেসে বললেন, 'স্বামী কেড়ে নিবি বলে বিয়ে করছিনে তাতেও শান্তি নেই। একদিনের আলাপে তুই আমার লেখক বন্ধুকে কেড়ে নিলি?'

রমা বলল, 'কাড়বইতো, সব কাড়ব। তুমি কুড়ানি, আমি কাড়ুনি।'
বললাম, 'এ পযন্ত কি কি কেড়েছেন তাই শুনি।'

সুজাতাদেবী বললেন, 'ওকে আর আপনি আপনি করবেন না। তুমি বলেই ডাকবেন। অতখানি লম্বা দেখলে কি হবে ওর বয়স মাত্র উনিশ।'

রমা বলল, 'কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয় বিষ, বয়ে হ্রস্ব ইকাব মূর্ধণ্য ষ।' শব্দটি বানান করে বুঝিয়ে দিয়ে রমা ফের বলল, 'কিন্তু উনিশই হই আর বিশই হই আপনি আমাকে তুমি বলতে পারবেন না কিন্তু। আমি তাহলে ভয়ানক রাগ করব। সুজাতাদি আমার রুমমেট আমার গার্জিয়ান নন। কনষ্টেবল বলে আমার দারোগা-দিদির বন্ধুরা আমাকে হেনস্থা করবেন আমি তা মোটেই চাইনে।'

হেসে বললাম, 'আচ্ছা, আপনাকে আমি রমা দেবী বলেই ডাকব।'

রমা বলল, 'জানেন, জামাইবাবুকে পর্যন্ত আমি সাবধান করে দিয়েছি।

বলেছি মাত্র ত্ৰদিনের আলাপে বাসর ঘরে গিয়ে দিদিকে ফস করে তুমি বলে ফেলেছেন বলুন, কিন্তু আমাকে অত চট করে তুমি-টুমি বলবেন না। ছমাস এক বছর যাক, ভালো করে আলাপ পরিচয় হোক তখন দেখা যাবে। সেই থেকে জামাইবাবু আমাকে রমাদি বলে ডাকতে শুরু করেছেন। তা ডাকুন, নেহাৎ বে-মানান লাগে না। আমাকে আমার দিদির মতোই দেখায় কিনা।'

খানিকক্ষণ বাদে রমা বিদায় নিল। যাওয়ার সময় বলল, 'চলি এবার, সুজাতাদি আমাকে মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছেন। বসে বসে গল্প করুন আপনারা। কিন্তু গল্প যখন লিখবেন আমাকে নিয়েই লিখবেন সে-কথা মনে থাকে যেন।'

হেসে বললাম, 'আচ্ছা'।

রমা চলে যাওয়ার পর ওকে নিয়েই আরো খানিকক্ষণ সুজাতা দেবীর সঙ্গে আমার আলোচনা চলল। তিনি বললেন, মেয়েটি সত্যিই খুব ভালো। মনটা খুব সরল। কোন রকম ঘোর-প্যাঁচ নেই। যা মনে আসে তাই বলে, একদিনের পরিচয়ে মানুষের সঙ্গে ও এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে যে মনে হয় কতদিনেরই না যেন আলাপ। সুজাতাদেবীর দাদা আর দাদার ত্বজন বন্ধুও রমার সঙ্গে আলাপ করে এই কথা বলেছেন। ভারি চঞ্চল, ছেলেমানুষের মত বুদ্ধি। হোস্টেলের সবাইকে ও জ্বালিয়ে মাবে। পদস্থদের অপদস্থ করবার দিকে ওর বেশি ঝোঁক। ছুটির দিনে কোন ঘুমন্ত মহিলা অফিসারের ঠোঁটে কালি দিয়ে গোঁফ আঁকবে, কোন কুমারীর কপালে সিঁথিতে লাল কালি মেখে তাকে বধূ সাজাবে এই সব দুষ্টু ফন্দি ওর মাথায়। জ্বালাতন করে বলে সকলের কাছেই গালাগাল খায়। কিন্তু ও নিজেও গায়ে মাখে না, অন্যেও সে কথা মনে করে বসে থাকে না। কারণ সবাই জানে ও হোস্টেলের প্রাণ। ও যেদিন ছুটি-ছাটায় বাড়ি যায় সেদিন হোস্টেল কানা। ও যতক্ষণ থাকে সুজাতা দেবীর মনে হয় তিনি যেন সেই কলেজের হোস্টেলে ফিরে গেছেন। অফিসের কাজকর্মের পর এতখানি স্ফূর্তি যে কারো মধ্যে উদ্বৃত্ত থাকতে পারে তা রমাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'মেয়েটি যে সত্যিই ভালো তাতে আমার এখন আর কোন সন্দেহ নেই।'

আমার ভঙ্গী দেখে সুজাতাদেবী হেসে বললেন, 'কেন, ও কথা বলছেন যে।'

বললাম, 'কোন পুরুষে যখন কোন একটি মেয়ের প্রশংসা করে, আমি তাতে কান দিইনে। কিন্তু কোন মেয়ে যখন একটি মেয়ের সুখ্যাতি করে আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠি। বুঝে নিই মেয়েটি একেবারে খাঁটি সতী না হলে স্বজাতীয়ার মুখে তার মাহাত্ম্য শুনতাম না।' বান্ধবী হেসে বললেন, 'আহাহা, মেয়েরা বুঝি মেয়েদের প্রশংসা করে না, মেয়েরা বুঝি মেয়েদের বন্ধু হয় না?'

বললাম, 'সেই অসম্ভব ব্যাপার ক্বচিৎ কখনো দেখা যায়। যেমন এখন গেল।'

এরপর মাস ছয় বাদে রমার সঙ্গে আমার দেখা হয় পুলিস হাসপাতালে। সুজাতা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ্যাপেনডিসাইটিসে ভুগছিলেন কিছুদিন ধরে। তারই চিকিৎসার জন্যে এসেছেন। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি রমাও সেখানে হাজির। রুমালে বেঁধে ফলটল নিয়ে এসেছে। খাটের কাছে বসে সুজাতার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'আসুন, সুজাতাদি রোজ আপনার কথা বলেন।'

সুজাতা দেবী বললেন, 'অসুখ-বিসুখ হলে মানুষে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কথা তো বলেই, কিন্তু তুই যে সুস্থ থেকেও সকাল সন্ধ্যা দুবেলা ওঁর নিন্দা না করে জল খাসনে তার কি হবে।'

হেসে বললাম, 'আমার খুব নিন্দা করে নাকি?'

সুজাতা দেবী বললেন, 'নিন্দা বলে নিন্দা, নিদারুণ নিন্দা। আপনার লেখা ওর ভালো লাগে না। আপনার প্রত্যেকটি গল্পের, প্রত্যেকটি বইয়ের ও প্যারডি করে, আপনার চেহারার কার্টুন এঁকে ও আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে, আপনার চলন-বলনের অনুকরণ করে—'

রমা বোধ হয় এবার খুব লজ্জা পাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সুজাতা দেবীর মুখে

হাত চাপা দিয়ে বলল, 'হয়েছে। এবার থামোতো দেখি। ডাক্তার না তোমাকে বেশি কথা বলতে বারণ করেছেন ?'

সুজাতা দেবীর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিলাম এবার। ডাক্তার বলেছেন এখন অপারেশন হবে না, পরে আর এক সময় এসে ভরতি হতে হবে। আর তিন চার দিনের মধ্যেই ছাড়া পাবেন। বান্ধবী বললেন, 'বেরোতে পারলে একা একা এভাবে পড়ে থাকতে কার ভালো লাগে বলুন। আপনারা কেউ আসেন-টাসেন না। শুধু রমা আসে। বিকেলের সিফ্‌টে ডিউটী না থাকলে ও রোজ এসে খবর নিয়ে যায়।'

এক ফাঁকে রমা বলল, 'আমার গল্পের কি হোলো। লিখেছেন আমাকে নিয়ে গল্প ?'

বললাম, 'আপনি অমন পাইকারীভাবে আমার নিন্দে করবেন, আর আমি আপনাকে নিয়ে গল্প লিখবো তাই ভেবেছেন বুঝি ?'

রমা বলল, 'ঠিক তাই ভেবেছি। মিত্রভাবে ভজনা করে তো হোলো না, তাই ভাবলুম শত্রুভাবে ভজনা করে দেখি তাতে যদি আপনার হাত দিয়ে মাস খানেকের মধ্যে একটি গল্প বেরোয়। আপনাকে এই ছমাসের মধ্যে কতবার তাগিদ দিলুম।'

তা ঠিক। তাগিদ দিতে রমা কার্পণ্য করেনি। এর আগে সুজাতা দেবীর সঙ্গে মাঝে মাঝে যখনই আমার ফোনে কথা হয়েছে, রমা তখন উপস্থিত থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরেছে। তারপর একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করেছে, 'কই, আমার গল্প কই ?'

'কিসের গল্প ?'

'আমাকে নিয়ে গল্প! এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?'

'ভুলব কেন। লিখব একদিন।'

'আর লিখেছেন। লিখবেন আমি মরলে। তখন আর গল্প নয়, তখন শোক সংবাদ লিখতে হবে। সবাই বলবে রমা নামে একটি মেয়ে ছিল, কল্যাণবাবু তাকে নিয়ে গল্প লিখলেন না সেই দুঃখে সে বুক ফেটে মরে

গেল। মরবার আগে আমি লিখে যাব আমার মৃত্যুর জন্যে লেখক শ্রীকল্যাণ-কুমার রায় দায়ী। আপনার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। আমার কলীগরাও টানা-হ্যাঁচড়া করতে পারে। তা যদি না চান, তাহলে গল্পটি লিখে ফেলুন।'

'তাই লিখব।' বলে হেসে ফোন ছেড়ে দিয়েছিলাম।

মেয়েটি খুব কৌতুকপ্রিয়, পরিহাস সুরসিকা। আর খুব বাকপটু। কিন্তু এমন মেয়ে নিয়ে তো আমি অনেক গল্প লিখেছি। আমার কোন গল্পে পাত্র-পাত্রীই বোবা নয়। বরং প্রত্যেকেই বাকপটু আর বাকপটিয়সী। আমার সমালোচক বন্ধুরা তাই নিয়ে ঠাট্টা করে বলেন, 'ওহে, দুচারটি বোবা মেয়ে নিয়ে গল্প লেখতো এবার। আর না হয় সুচ-সুতো দাও, আমরা তাদের মুখ সেলাই করে রাখি।'

মনে মনে তাই সঙ্কল্প করেছি যে মেয়ে বেশি চালাকচতুর, বেশি কথাবার্তা বলে আপাতত তাকে নিয়ে আর গল্প লিখব না।

হাসপাতালে ঘণ্টা পড়ল। সাক্ষাতের সময় শেষ হয়েছে। ওঠবার আগে বান্ধবী আবার বললেন, 'সত্যি কল্যাণবাবু, দোহাই আপনার, রমাকে নিয়ে গল্প একটি আপনি আজই গিয়ে লিখে ফেলুন। লিখে মাসিক হোক, সাপ্তাহিক হোক কোন একটা কাগজে ছেপে দিন। গল্প গল্প করে ও আমার কান ঝালাপালা করে ফেললে।'

হেসে বললাম, 'আপনারা দুই বন্ধু কেউ বেশি গয়নাগাটি পরেন না। কিন্তু একটি অলঙ্কার দেখছি আপনাদের খুব প্রিয়।'

বান্ধবী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কি, আমার এই রিষ্টওয়াচটির কথা বলছেন।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না, সে অলঙ্কারের নাম অতিশয়োক্তি।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রমাকে বললাম, 'আসুন, একটু চা খাওয়া যাক।'

রমা যেন আঁতকে উঠল, 'ওরে বাবা, চা-টা আমি খাইনে।'

বললাম, 'আপনি না খান আমি খাব। আপনি বসে বসে দেখবেন।'

রমা বলল, 'শুধু আমি বসে বসে দেখলে কোন ভয় ছিল না, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি পথ দিয়ে যেতে যেতে যে অনেক লোক দেখবে তার কি।'

হেসে বললাম, 'তা দেখলই বা। আমার মতো একজন বয়স্ক লেখকের সঙ্গে চা খেতে আপনার এত ভয়, আর আপনাকে নিয়ে আমি কি করে গল্প লিখি বলুন তো।'

রমা বলল, 'ও, সত্যি গল্প লিখবেন ? তাহলে চা কেন, আপনার সঙ্গে বিষ খেতেও আমি রাজী আছি। অবশ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা কে না জানে। চা মানেই বিষ।'

ধারে-কাছে ভালো চায়ের দোকান নেই। একটা সস্তা দোকানেই ওঠা গেল। সে দোকানে আবার মেয়েদের নিয়ে আলাদা বসবার মতো কেবিন-টেবিন কিছুই নেই।

রমা বলল, 'এ যে একেবারে হাট।'

আমি বললাম, 'এই হাটই ভালো। আপনার যা ভয় তাতে কোন পার্টিসন দেওয়া কেবিনের মধ্যে ঢুকলে আপনি ভয়ে মূর্চ্ছা যেতেন।'

রমা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'সে জন্যে নয়। আপনাকে আমার কোন ভয় নেই। কিন্তু জানেন তো চাকরি-বাকরি করে খাই। কেউ কিছু রিপোর্ট-টিপোর্ট করে দিলে চাকরিটি যাবে। অমনিতেই মেয়েছেলে বলে কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ঠাট্টা-তামাসা সহ্য করতে হয় আমাদের, আপনি তো সব জানেন না।'

এবার দেখলাম রমার নিজের মুখে তামাসার ভঙ্গী নেই, মুখের কথায় নেই ঠাট্টার সুর। আমি ওর দিকে তাকাতেই রমা চোখ নামিয়ে নিল।

বললাম, 'তাহলে চলুন চা খেয়ে কাজ নেই। বেরিয়ে পড়া যাক।'

রমা বলল, 'না না সে কি হয়, এসেছি যখন খেয়েই যাই।'

অপেক্ষাকৃত নিরালা একটা কোণ বেছে নিয়ে বসলাম। দোকানের 'বয়'কে ডেকে দুকাপ চা আর দুটো চপ দিতে বললাম।

রমা বলল, 'আবার চপ কেন, আপনি কি আমাকেও হাসপাতালে পাঠাতে চান ?'

একটু বাদে বললাম, 'আপনি এই বয়সে চাকরি করতে এলেন কেন। কেন আরো পড়াশুনো করলেন না ?'

রমা বলল, 'পড়াশুনা কি সবাইর হয়। বাবা রিটায়ার করেছেন। মাইনের অর্ধেক পান। অনেকগুলি ভাইবোন। বললাম, ওরাই পড়ুক। আমি চাকরি-বাকরির চেষ্টা করি। বাবা তাতে রাজী নন। তিনি দিদির মত আমার বিয়েই দিয়ে দিতে চান। কিন্তু বিয়ে দেওয়া তো সহজ নয়, বিশেষ করে আমার মত লম্বা মেয়ের।' বলে রমা একটু হাসল। তারপর বলল, 'আমার জামাইবাবু কি বলেন জানেন। তিনি বলেন, 'তুমি যে রকম লগির মত লম্বা তাতে তোমার বর এদেশে জুটবে না রমা। হয় পাঞ্জাবী শিখ, না হয় ইয়াঙ্কি সাহেব এদের কারো ভিতর থেকে আমার ভায়রাভাইকে খুঁজে নিতে হবে।' আমি বলেছি, 'খোঁজাখুঁজি আপনারা করুন। আমি ততদিন দুএক বছর চাকরি করে পণের টাকার কিছুটা জোগাড় করে রাখি। আপনি যে পরিমাণ নিয়েছেন তাতে আপনার ভায়রাভাইকে দেওয়ার মতো বাবার হাতে কিছু আছে তা মনে হয় না।'

'আপনার বাবা রাজী হলেন?'

'পুরো রাজী নয় নিম-রাজী, আমি কোন রকমে পায়ের ধুলো নিয়ে পাশ কাটিয়ে খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে পডলাম।'

হেসে বললাম, 'খুব ভয় করেন বুঝি আপনার বাবাকে?'

রমা বলল, 'ওরে বাব্বা, ভয় মানে? আমাদের পুলিস কমিশনারকেও অত ভয় করিনে। আমার বাবার সঙ্গে যদি কোন দিন আপনার আলাপ-পরিচয় হয় খবরদার বলে বসবেন না যেন আপনার সঙ্গে আমার এত খাতির। আপনার সঙ্গে আমি সমবয়সীর মতো ঠাট্টা-তামাসা করি, একথা কখনো বলবেন না, বুঝেছেন।'

বললাম, 'তাই কি বলতে পারি। তাহলে কি আমারও মান থাকবে?'

রমা বলল, 'ঠিক বলেছেন। নিজের মানের জন্যই আমার প্রাণ বাঁচাবেন।'

একটু বাদে রমা বলল, 'আপনার খাতিরে এই বিশ্রী চা তো ঢক ঢক করে গিলে ফেললুম। এবার আমাকে নিয়ে সত্যিই খুব ভাল করে একটা গল্প লিখছেন তো?'

বললাম, 'গল্পের কথা দেখছি আপনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে কি গল্প লিখব বলুন তো। আপনাকে নিয়ে গল্প তো ভালো ভ্রমণ কাহিনী-টাহিনীও লেখা যায় না।'

রমা প্রতিবাদ করে বলল, 'না লেখা যায় না! আপনি লিখতে পারেন না তাই। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।'

হেসে বললাম, 'বোধ হয় তাই। বেশ যদি লিখতেই হয় বলুন আপনাদের অফিসের খবর-টবর। বলুন সেখানকার এ্যাটমস্‌ফিয়ার কি রকম।'

রমা চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওরে বাব্বা। আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন? ফাঁকি দিয়ে আমাদের ঘরের কথা আপনি বের করে নেবেন। গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি। দেখুন, আমরা আই বি অফিসের লোক। অন্যের ঘরের গোপন কথা আমরা বের করে আনি, নিজেদের ঘরের কথা কাউকে জানাইনে। বরং আপনার এই অতিরিক্ত কৌতূহলের জন্যেই আপনার পিছনে টিকটিকি লাগিয়ে দিতে পারি তা জানেন? আমাদের সঙ্গে যখন আলাপ করবেন, খুব বুঝে-শুনে কথা বলবেন। বেফাঁস কিছু বলে ফেললেই ফাঁসী।'

বললাম, 'থাক, তাহলে আপনাদের অফিসের কথায় আর কাজ নেই।'

রমা বলল, 'সত্যি কাজ নেই। অফিস নিয়েই যদি লিখতে হয় নিজেদের অফিস নিয়ে লিখুন। যে অফিসে রোজ যাচ্ছেন, রোজ কাজ করছেন। দেখা অফিস ছেড়ে শোনা অফিসের কথা কেন লিখতে যাবেন। না অফিস-টফিস নয়। আমাকে অফিসের বাইরে রেখেই যা হয় লিখুন আপনি।'

বললাম, 'আমাদের জীবন থেকে অফিস বা' দিলে তো থাকে শুধু ফিস্ ফিস্। আপনার সেই ধরনের দু-একটা কাহিনী বলুন তাহলে।'

এবার লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল রমা। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপর আমার দিকে সোজা তাকিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'আমার জীবনে যদি তেমন কোন গল্পই থাকত, তাহলে সেই গল্প নিয়েই দিনরাত মেতে থাকতুম। আমাকে নিয়ে গল্প বানাবার জন্যে আপনাকে এত সাধাসাধি করতুম না। কাহিনী আর কি। কাহিনী যতটুকু শুনলেন তাই। স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে

ঢুকলাম। দুবছর বাদে সেখান থেকে বেরিয়ে ঢুকেছি অফিসে। বাস। খাই দাই চাকরি-বাকরি করি। সুখে-দুঃখে দিন কাটে। এই হোলো কাঠামো। এর ওপর আপনি যত খুশি রং চড়ান্ আমার কিছুতে আপত্তি নেই। আমাকে পুলিস রেখে সুবিধে না হয়, চোর করুন, জোচ্চোর করুন, বৈধভাবে হোক অবৈধভাবে হোক, একজনের সঙ্গে, পাঁচজনের সঙ্গে প্রেমে পড়ান, আমি কিছুতে আপত্তি করব না। শুধু একটি মাত্র শর্ত।'

'কি শর্ত বলুন।'

রমা বলল, 'গল্পের মধ্যে আমার নামও থাকবে, আমিও থাকব। আপনার লেখা পড়ে যেন আমাকে আমি চিনতে পারি, আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন যেন আমাকে চিনতে পারে।'

'আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে' বলে সেদিন রমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিনই বুঝেছিলাম ওকে নিয়ে গল্প লেখা আমার হবে না। এ বড় কঠিন শর্ত। 'আমি থাকব আর আমার নাম থাকবে।' ভাবলাম, এ আকাঙ্ক্ষা শুধু লেখকদেরই নয়, পাঠক-পাঠিকাদেরও আছে। কিন্তু এ সাধ কজনের মেটে। অত বেশি সাধ্য কজনের থাকে। রমার নামটাই শুধু ব্যবহার কবতে পারি কিন্তু ওর যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব তা ফুটিয়ে তোলার সাধ্য আমার নেই। লিখতে গেলে আমার আরো পাঁচটি গল্পের নায়িকাদের ছাঁচে রমাকেও গড়ে তুলব। কিন্তু ও শুধু আরো পাঁচজনের মতো নয়। ও আরো পাঁচজনের মতো হয়েও আলাদা একজন। যে বৈশিষ্ট্য ওর বাবার চোখে ধরা পড়ে, যে বৈশিষ্ট্য ওর মা ওকে আদর করবার সময় টের পান, যে বৈশিষ্ট্য ওর প্রেমিক কি স্বামী প্রতি মুহূর্তে অনুভব করবে তাই যদি না দিতে পারলাম তাহলে আর কি হবে লিখে। তাই ওই কঠিন শর্তের মধ্যে আমি আর গেলাম না। তাদের নিয়েই গল্প লিখতে লাগলাম যারা আমার গল্পে নিজেদের অল্প একটু পেয়েই খুশি হয়। তাদের পুরোপুরি আঁকতে পারলাম না বলে যারা আমার কার্টুন আঁকে না। আমি জানি পুরোপুরি কাউকে গল্পে আনা যায় না। অন্য কেউতো দূরের কথা, সবচেয়ে যাকে বেশি

করে জানি সেই আমাকেই কি আমি অবিকল ফুটিয়ে তুলতে পারি ? পারিনে, পারিনে আর বোধ হয় পারতে চাইওনে।

অবশ্য রমা ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার খোঁচা দিল, 'কই, আমার গল্পের কি হোল।'

আমি জবাব দিলাম, 'হবে হচ্ছে।'

বছর খানেক বাদে খবর পেলাম রমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বান্ধবী হেসে বললেন, 'আপনি বাঁচলেন। এবার থেকে রমা ওর নিজের গল্প নিজেই লিখবে। আপনাকে আর সাধ্য-সাধনা করতে যাবে না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বিয়ের আগে পূর্বরাগের ব্যাপার-ট্যাপার কিছু ছিল নাকি ?'

বান্ধবী বললেন, 'না না সে সব কিছু নয়। রমার 'অতীত' বলে কিছু নেই। ও একেবারে ভবিষ্যতের মেয়ে।'

আরো শুনলাম ওর বর খুঁজবার জন্যে রমার জামাইবাবুকে পাঞ্জাবে কি আমেরিকায় যেতে হয়নি, রমার পতি তার ভগ্নীপতির মতোই বাঙালী ভদ্রলোক। ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ করেন। গ্রেড খুব উঁচুও নয় মাঝামাঝি। ভবানীপুরেই বাসা। শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর-ননদ সবই আছে। না, চাকরি আর রমাকে করতে হয় না। চাকরি ছাড়তে ও আপত্তি করেছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে সে আপত্তি টেকেনি। তবে চাকরি করতে না দিলেও রমাকে তারা আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ও ইচ্ছামত বেরোতে পারে, পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধা নেই। শাঁখা-সিঁদুর পরে আগের হোস্টেলে মাঝে মাঝে রমা বেড়াতে আসে। নিজের স্বামীর সঙ্গে সুজাতাদির আলাপ করিয়েও দিয়েছে। ভদ্রলোকও বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মানিয়েছে ভালোই। রমা সুখেই আছে।

বান্ধবী বিবরণ শেষ করে হেসে বললেন, 'আপনাকে কিন্তু খোঁচা দিতে ও আজও ভোলেনি।'

বললাম, 'কি রকম।'

'ও বলে, জানো সুজাতাদি, বিয়ের আগে ভালোবাসার সুযোগ-সুবিধে যখন হোলোই না, তখন বিয়ের পরে ভালোবেসেই খুশি থাকতে হবে। শুধু দুঃখ এই আমার লভম্যারেজও হোলো না, কল্যাণবাবুও আমাকে নিয়ে আর গল্প লিখলেন না। এখন যদি স্বামী ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি, কি কারো সঙ্গে পালিয়ে যাই, তাহলে হয়তো উনি ফের কলম নিয়ে বসবেন। কিন্তু তুমিই বল সুজাতাদি একটা গল্পের জন্যে অত বড় ঝুঁকি নেওয়া কি ভাল।'

আরো বছর দেড়েক বাদে সুজাতাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ওঁর হোস্টেল পর্যন্ত যেতে হোল না। বড রাস্তার মোড়ে ট্রাম ষ্টপেজটার কাছেই দেখা হয়ে গেল।

সুজাতাদেবী হেসে বললেন, 'এই যে আপনি! যেদিন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকবে সেদিন আসবেন না আর যেদিন আসবেন, একেবারে না বলে-কয়ে হুট করে এসে পড়বেন। আচ্ছা—গল্পের লেখক হলে কি গল্পের নায়ক হতে হবে!'

হেসে বললাম, 'নায়ক হতে পারলে কি আর লেখক হতাম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন এদিকে?'

বান্ধবী বললেন, 'হাসপাতালে রমাকে দেখতে।'

উদ্বিগ্নভাবে বললাম, 'কেন, কি হয়েছে রমার।'

বান্ধবী হেসে বললেন, 'ঘাবডাবেন না। অসুখ নয়, সুখ। ছেলে হয়েছে। চলুন আমাব সঙ্গে, দেখে আসবেন।'

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'আমি যাব!'

বান্ধবী বললেন, 'আসুন না, আপনাকে দেখলে রমা খুব খুশি হবে। ও এখনো আপনার কথা মাঝে মাঝে বলে, বই-টই পড়ে।'

এবার আর পুলিস হাসপাতাল নয় প্রসূতিসদন। সেখানে দেখা হোল রমার সঙ্গে। লেবার ওয়ার্ডে সারি সারি বেড। তার একটিতে রমা শুয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে প্রথমে ভারি অপ্রস্তুত আর ভারি লজ্জিত হোলো কিন্তু সেই সঙ্গে খুশিও যে হোলো তা বুঝতে পারলাম।

বেডের দুদিকে দুটো টুল টেনে আমরা দুজনে বসলাম। রমা আমার দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল, 'আপনি যে আসবেন ভাবতে পারিনি।'

সুজাতা দেবী বললেন, 'কি করে পারবি। সুনীল চাটুয্যে ছাড়া তুই কি আজকাল আর কারো কথা ভাবিস? সুনীলবাবু কই? তিনি আসেননি?'

রমা বলল, 'না এখনো আসেননি। তাঁর আসতে আজ একটু দেরি হবে। কাজের চাপ পড়েছে অফিসে।'

তারপর আমার দিকে ফিরে তাকালো রমা, 'এর মধ্যে শুয়ে শুয়ে আপনার অনেক গল্প পড়লুম কিন্তু আমাকে নিয়ে সত্যি সত্যি একটি গল্পও আপনি লিখলেন না। কত রকমের কত পরিবর্তনই তো হোলো কিন্তু কিছুই আপনার লেখার মতো হোলো না।'

মায়ের দুধ খাওয়াবার জন্যে দাই এল বাচ্চাকে নিয়ে। বেশ সুন্দর, মোটা-সোটা ফরসা হয়েছে ছেলে। আমি একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম। খানিক বাদে দাই শিশুটিকে নিয়ে চলে গেলে আবার এসে বসলাম আমার টুলে।

রমাকে বললাম, 'আপনার বাচ্চাতো বেশ সুন্দর হয়েছে।'

রমা একটু লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল। দেখলাম ওর সেই প্রগলভতা আর নেই।

সুজাতা দেবী বললেন, 'হ্যাঁ, নাক-চোখ ঠিক বাপের মতোই হবে।'

আরো কিছুক্ষণ বাদে আমি উঠে পড়লাম।

রমা বলল, 'আমার গল্পের কথা মনে থাকে যেন।'

হেসে বললাম, 'এখনো গল্প? আপনি নিজেই তো এক নতুন গল্প লিখে ফেললেন।'

রমা ফের মৃদু হেসে মুখ নিচু করল।

বান্ধবী বললেন, 'নিজে নয় নিজেরা বলুন, সুনীলবাবুর সঙ্গে কলাবোরেশনে।'

রমা লজ্জা পেয়ে বলল, 'সুজাতাদি আজকাল এত ফাজিল হয়েছে।'

সুজাতাদেবী বললেন, 'আমরা ভাই শুধু মুখে ফাজিল।'

রম্যা এবার আমার দিকে হেসে তাকাল, 'সত্যি, ওর একটা গতি দেবেন কল্যাণবাবু। ওর হালচাল দেখে ভয় হয়। ভেবেছিলাম আমি ওঁর সতীন হব, কিন্তু এখন দেখছি—।'

সুজাতা দেবী হেসে বললেন, 'হতভাগা মেয়ে তোমার এখনো পেটে পেটে এত—'

দুই বন্ধুকে হাসি-ঠাট্টা আব গল্প-গুজব করতে দিয়ে আমি এক ফাঁকে বিদায় নিলাম।

ঠিক ওই রম্যাকে নিয়ে আজও গল্প লিখতে পারিনি। চেষ্টাও করিনি। আমি জানি ওর জীবনে আজ গল্পের উপাদানেব অভাব নেই। একটি মেয়ের স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসাব কবার মধ্যে একটি কেন অনেক গল্পই ছড়িয়ে আছে। তাব দৈনন্দিন দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমান, ক্ষণিকের বিচ্ছেদের শেষে মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ, ছেলেকে নিয়ে তার স্নেহ সোহাগ, তার সর্দ্দিকাশিতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে গল্পরসের, নাট্যবসের অভাব নেই তা আমি মানি। তবু একজন লেখক গুনে গুনে কজনকে নিয়েই বা গল্প লিখতে পারে। কজনই বা তার কলমের মুখে ধরা দেয়। জীবনে অলিখিত গল্পের নায়িকারাই সংখ্যায় বেশি থেকে যাবে। সবাইকে ধরা যাবে না। শুধু প্রত্যাশা এই, জীবনভোর লিখতে লিখতে যাদের একটু-আধটু ধরা-ছোঁয়াও পাব, তাদের ভিতব দিয়ে যদি সেই অধরা বিম্বাধরাদেব কিছুটা আভাস পাই, কিছুটা আভাস দিয়ে যেতে পাবি।